শৈশবের কথা

স্তুজান আইজ্যাকস

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
অনুবাদক

ওরিয়েন্ট লংম্যান্স

শৈশবের কথা

Dr. Susan Isaacs রচিত

The Children We Teach গ্রন্থ অনুসরণে লিখিত

অনুবাদক

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ.,

ডিপ্লোমা ইন টিচিং (লণ্ডন),

অধ্যক্ষ, টীচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কলিকাতা কর্পোরেশন

ও রি য়ে ণ্ট লং ম্যা ন্স

কলিকাতা :: বোম্বাই :: মাদ্রাজ

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতৃদেবের শ্রীচরণে

ভূমিকা

এখন সকল দেশেই শিশুদের সাত বছর বয়স থেকে আরম্ভ ক'রে সাত বছর বা তদূর্দ্ধকাল আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স ধরা হয়। আমাদের সংবিধানেও সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বা বুনিয়াদী শিক্ষার নির্দ্দেশ আছে; সে ব্যবস্থা সেদিন পূর্ণরূপে সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হবে, সেটি বাস্তবিক দেশের মহা শুভদিন ব'লে গণ্য করা যাবে। এই শিক্ষার প্রথম অংশটি অর্থাৎ সাত থেকে এগার বছর পর্য্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা অভিহিত হয়। শৈশব জীবনের ক্রমপরিণতির মধ্যে এই কটি বছরের গুরুত্ব নানাভাবে আমরা উপলব্ধি করি। ছোট শিশু বাড়ীতে মা বাপের উপর একান্ত নির্ভরশীল অবস্থাটি পার হয়ে বহির্জগতের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ও জ্ঞানের প্রভাবে এগার বছরে যে অনেকখানি স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও সামাজিক জীবে রূপান্তরিত হয়, সেই ক্রমপরিবর্ত্তনের ধারা বিবিধ ছন্দ ও বৈচিত্র্যে এই কয়টি বছরের মধ্যে চলতে থাকে। এই বয়সের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের কথাই সংক্ষেপে এই পুস্তকে বলা হয়েছে, এবং শিশুর পালন ও শিক্ষার দিক থেকে এগুলির তাৎপর্য্য আলোচনা করা হয়েছে।

যে মূল ইংরাজী গ্রন্থ অনুসরণ ক'রে এই বইখানি লিখিত হ'ল, তার লেখিকা ডাঃ সুজান আইজ্যাকসের নাম সারা পৃথিবীর সুধী সমাজে সমাদৃত; শিশু মনোবিদ্যায় তিনি অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি

লাভ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্যগুলিকে এ দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পাঠকদের উপযোগী ক'রে সাজাবার জন্য তাঁর পুস্তকটি আগাগোড়া নূতন ক'রে লেখা হয়েছে ; অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন করা হয়েছে এবং বহু নূতন কথাও যোগ করা গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নিজ যুক্তিগুলি অব্যাহত আছে।

এই পুস্তকটি রচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যাবিভাগের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ শ্রীসুধীন্দ্র নাথ মিত্র আমাকে উপদেশ ও তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন, সেজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁদের ছবি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছেন ; ছবির সম্পর্কে সতীর্থ শ্রীনরেশ চন্দ্র দাস ও শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাগ্রহ সহায়তা পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর বইখানির প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আমি অশেষ ও অমূল্য সাহায্য পেয়েছি, যাদের নিয়ে লেখা এই গ্রন্থ, সেই সব শিশুদের কাছ থেকে ; তাদের কথাবার্ত্তা, তাদের নাচ গান, আমোদ প্রমোদ, তাদের খেলা, পড়া, কাজ, সখ, নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করে যেমন বইটির তথ্য ও উপকরণ লাভ হয়েছে, তেমনই আনন্দ ও উৎসাহও পেয়েছি প্রচুর। তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিমেয়। পাঠকদের কাছে তাদের কথাগুলি আলোচনা করার বিষয়ে যদি একটুও সাফল্য ঘটে থাকে, তবে আসল কৃতিত্ব তাদের।

কলিকাতা,
৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৫

যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

সূচী

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। শিশু, শিক্ষক ও মনোবিৎ

শিক্ষাপ্রণালীর যে সমস্ত উন্নতি আধুনিক সময়ে দেখা যায়, তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল এই যে, শিশুরাই যে আসলে অধ্যাপনার কেন্দ্র, সে কথাটি মেনে নেওয়া হয়েছে। আগেকার দিনে শিক্ষকদের প্রধান চিন্তা ছিল পড়াবার বিষয় ও পদ্ধতি, আর বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্মের ব্যাপার। কিন্তু যে শিশুগুলি বিদ্যালয়ে শিক্ষা পায় তাদের সম্পর্কে যে কত রকমের সব কথা ভাবতে হয়, সে বিষয় বিবেচনা করা হত না। রুশো (Rousseau) তাঁর যুগান্তকারী এমিল (Emile) গ্রন্থে এই কথা বলেছিলেন, "প্রত্যেক মানুষের মনের নিজস্ব একটি আকার আছে, সেই অনুযায়ী তাকে চালিত করতে হবে। আর শিক্ষকের চেষ্টা সাফল্যযুক্ত করতে হ'লে, এ কথাটির উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে যে, মানসিক চালনা যেন এই নির্দ্দিষ্ট আকার অনুসারেই হয়, অন্যভাবে নয়।" রুশো ও তাঁর অনুগামী পেষ্টালৎসি (Pestalozzi) ফ্রেবেল (Froebel) এবং অন্যান্য বরেণ্য শিক্ষা-সংস্কারকগণের প্রয়াসে এই পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। শিশুর শিক্ষা ও তার মানসিক, শারীরিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশের গুরুত্ব দিন দিনই বেশী ক'রে স্বীকৃত হচ্ছে। শিশু-মনোবিদ্যায় পারদর্শী

পণ্ডিতেরা শৈশব পরিণতির নানা ধারণা অনুসরণ ক'রে যে বহু মূল্যবান পরীক্ষামূলক তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তার ফলেও এখনকার শিক্ষক তাঁর হাতে ন্যস্ত শিশুগুলির উপরই বিশেষভাবে মনোযোগ দেন।

অতএব এই গ্রন্থে বিদ্যালয় ও শিক্ষাদানের প্রণালী আমাদের অতটা চিন্তার বিষয় হবে না, যতটা হবে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুগুলি। এরাই হল অধ্যাপনার জীবন্ত লক্ষ্য ও সার্থকতা। তাদের চিন্তা, জ্ঞান, চরিত্রগঠন ও বিকাশসাধনের জন্যই শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব। শিশুরা কেমন শিখছে ও বুঝতে পারছে, তাদের শারীরিক পরিণতি ও সামাজিক বোধ কতখানি উন্নত হচ্ছে, এই সবের দ্বারাই শেষ পর্যন্ত শিক্ষাদান পদ্ধতির সাফল্য বা বিফলতা নির্ণীত হয়।

অবশ্য একটি কথা স্বীকার করতে হবে যে, মনোবিদ্যার পুঁথিগত জ্ঞান খুব গভীর হলেও কেবল তার সাহায্যেই বিদ্যালয়ের কাজে সাফল্য আসবে না। স্বাভাবিক গুণে আর অভিজ্ঞতা থেকে শিশুদের বিষয়ে যে অন্তর্দৃষ্টি ও তাদের সঙ্গে যে একটা প্রত্যক্ষ যোগ পাওয়া যায়, নীতি বা পদ্ধতি সম্বন্ধে কেবল ধারণালব্ধ জ্ঞান তার স্থান নিতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোবিদেরা শিশুদের মন সম্বন্ধে, তাদের চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সব সাধারণ তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছেন, সেগুলি জেনে নিলে, অধ্যাপনারত কৃতী শিক্ষকেরও কিছু উপকার হতে পারে।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, মনোবিদের একটি বড় সুবিধা আছে, সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তা থাকে না। মনোবিৎ শিশুগণের বিকাশ সব দিক থেকে ও সমগ্রভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। শুধু একটি শ্রেণীর বা বিদ্যালয়ের শিশু, অথবা কোনও একটি নগরের শিশুদের মধ্যে তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ নয়। তিনি লক্ষ্য করেন তাদের শেখবার ধরণ, তাদের খেলাধূলা, তাদের মানসিক বিকাশের গতি ও বিভিন্ন বয়সে

তাদের ভাবাবেগ ও চিন্তার স্বরূপ। আর নানা বয়সের শিশু, বিভিন্ন স্থান ও কালের, সব রকমের শিক্ষাবিধির অন্তর্ভুক্ত শিশুদের সম্পর্কেই এই তথ্যগুলি জানবার সুযোগ তিনি পান। এইরূপ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শিশুদের দেখার ফলে, তাদের পরিণতির ধারাও তিনি আরও বেশী ক'রে লক্ষ্য করতে পারেন, তারা সচরাচর কিভাবে বেড়ে উঠে তা ভালভাবে বুঝতে পারেন। যে শিক্ষক শুধু একটি বিদ্যালয়ের বা স্থানের শিশুদেরই ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যে রয়েছেন, তাঁর সে সুযোগ নেই। তা ছাড়া শিশুদের আসল রূপটি কি, তা জানবার অবকাশও মনোবিদেরই বেশী। কারণ, শিক্ষকের মত হাতে কলমে পড়ানোর ভাবনা ত মনোবিদের নেই, তিনি শিশুদের আচরণ লক্ষ্য করার কাজেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে পারেন, সেই আচরণ প্রতিক্ষণে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, সে কথা তাঁকে ভাবতে হয় না। শুধু বিদ্যালয়ের মধ্যে নয়, বিদ্যালয়ের বাইরেও তাঁর পর্য্যবেক্ষণের ক্ষেত্র; বাড়ী, রাস্তা, বেড়াবার জায়গা, যেখানেই শিশুদের দেখা যায়, সেখানেই তিনি তাদের দেখতে ও তাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পারেন। নানা বয়সের নানা অবস্থার শিশুদের আচরণের মূল্য নিরূপণ এবং তুলনা করবার বহুবিধ পন্থা তাঁর আছে, সুতরাং সাধারণ দৃষ্টির চেয়ে তাঁর অভিমতই অধিকতর নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে।

অপর দিকে আবার যদিও নানা বয়সের ছেলেমেয়েদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিই তাঁর আগ্রহ, তথাপি তিনি যখন তাদের পৃথকভাবে লক্ষ্য করতে চান, সে কাজও তিনি শিক্ষকের তুলনায় বেশী স্বাধীনভাবে ও সম্পূর্ণরূপে করতে পারেন। শিক্ষক যতই করিতকর্ম্মা হন না কেন, সমগ্র শ্রেণীর প্রতি তাঁর দায়িত্ব ফেলে শুধু একটি ছাত্রকে ভালরূপে বোঝার চেষ্টা করা ত তাঁর পক্ষে চলে না। কিন্তু মনোবিদ অনেক

সময়ে একটি মাত্র শিশুর মনই সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং এই কার্য্যে বিজ্ঞানের সমস্ত সহায়তাও তিনি পান। সুতরাং সময়ে সময়ে তিনি এমন সব তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হন, যা নিপুণ এবং সহানুভূতিশীল শিক্ষকের কাছেও অজ্ঞাত থেকে যেতে পারে।

লেখাপড়ায় পেছিয়ে পড়া ছেলেদের বেলায় এর দৃষ্টান্ত সহজেই পাওয়া যাবে। হয় ত শ্রেণীতে ভাল পড়ানো সত্ত্বেও শিশু কোনও বিষয়ে, যেমন পাঠশিক্ষায়, খুব বেশী পিছনে পড়ে আছে। এমনই এক ঘটনা দেখা গিয়েছিল একটি তের বছরের মেয়ের। তার বই পড়তে পারার শক্তি পাঁচ বছরের শিশুর চেয়ে বেশী নয়। পড়ার বিষয়ে এই অক্ষমতা স্বভাবতঃই বিদ্যালয়ের সকল পাঠে এবং সাধারণরূপে তার প্রক্ষোভ বা ভাবের বিকাশেও বড় প্রতিকূল ফল এনে দিয়েছে। সকল ব্যাপারেই তাকে মন্দ এবং বেয়াড়া দেখা গেছে, এবং তাই মনোবিদ্যা-সঙ্গত পরীক্ষার জন্য তাকে পাঠান হয়েছে। ভালভাবে পরীক্ষা করার পরে দেখা গেল যে মেয়েটির বুদ্ধির মান প্রায় স্বাভাবিক পর্য্যায়ের, কিন্তু সে প্রথম যখন বই পড়তে শেখে, তখন সে শিক্ষা তার ঠিক মত অগ্রসর ও সম্পূর্ণ হতে পারেনি ব'লেই সে সাধারণভাবে সব বিষয়ে পেছিয়ে পড়ে রয়েছে। আর দেখা গেল যে পড়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে, এবং পূর্ব্বে যা অসুবিধা ছিল তার ভালরূপ অনুসন্ধান ও উপযুক্ত প্রতিবিধান করার ফলে, পড়ার এই ত্রুটীও দূর করা যাচ্ছে। এইভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেখা গেল যে তার পড়বার শক্তি দশবৎসর বয়সের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে, এবং তার চরিত্রে ও বিদ্যালয়ের ফলাফলেও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সম্পূর্ণ আশা দেখা যাচ্ছে।

মনোবিদের বিশেষ জ্ঞান যে শিক্ষায় কিভাবে কতখানি সহায়ক হয়, তার আর একটি উদাহরণস্বরূপ এক সাত বছরের ছেলের কথা বলা

যাচ্ছে। এ ছেলেটির পাঠে আদৌ আগ্রহ ছিল না, সব বিষয়েই সে পেছিয়ে ছিল, পড়তেই চাইত না। তার বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী কিছুতেই বুঝতে পারতেন না যে ছেলেটি সত্যই নির্ব্বোধ, না শুধু কুড়ে। সুতরাং অন্য সব ছেলের মধ্যে তাকে কোন স্থানে ফেলবেন, তাও ঠিক করতে তিনি পারতেন না। বালকটিকে অভীক্ষাপ্রশ্নের সাহায্যে (এর বিষয়ে পরের অধ্যায়ে বলা যাবে) খুব ভালরূপে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তার মানসিক শক্তির মান প্রায় সাধারণ; সুতরাং চেষ্টা ও মনোযোগ জাগাবার সাধারণ পদ্ধতিগুলি তার বেলায় না খাটবার কোনও কারণ নেই। অবশ্য কুড়েমি এক গুরুতর অন্তরায়, কিন্তু এই পরীক্ষার পর ছেলেটির শিক্ষয়িত্রী অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পারলেন যে তার পিছনে তাঁর সময়টুকু নিছক নষ্ট হচ্ছে না। এবং ছেলেটিকে শ্রেণীর সমান পর্য্যায়ে রাখতে চেয়ে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছুও দাবী করা হচ্ছে না।

এই রকম বহু ব্যক্তিগত পর্য্যবেক্ষণের ফলে মনোবিৎ সময়ে সময়ে এমন সব কার্য্যকরী সূত্র উদ্ভাবন করতে পারেন, যার সাহায্যে সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী অনেক অধিক বৈচিত্র্যময় ও উপযোগী হয়।

আধুনিক কালে মনোবিদ্যাশাস্ত্র যে একটি ব্যাপারে শিক্ষককে প্রভূত সাহায্য করে, সেটি হচ্ছে, কি কি কারণে ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের পড়াশুনায় পেছিয়ে পড়তে পারে, তারই একটা সঠিক ধারণা দেওয়া; উপরের দুটি দৃষ্টান্তে আমরা তাই দেখতে পেলুম। পরে আবার আমরা এই প্রশ্নটীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করবো, তখন পশ্চাৎপরতার নানাবিধ কারণ ও তার প্রতিকারের কথাও চিন্তা করা যাবে।

এখন আর এক ধরণের ব্যক্তিগত সমস্যার একটি মজার উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। সাড়ে ছয় বৎসর বয়সের একটি মেয়েকে কয়েকটি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল। একটি শব্দ ছিল 'স্বাস্থ্য'। মেয়েটি

বেশ বুদ্ধিমান ও সপ্রতিভ ভঙ্গীতে এই অদ্ভুত উত্তর দিলে, "স্বাস্থ্য হচ্ছে যা দিয়ে দাঁত তোলে!" এই উত্তর থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষকের বা বড়দের কথার অর্থ শিশুর মনোভাব অনুযায়ী কি ভাবে বদলে যায়। মেয়েটি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ও শরীর সুস্থ রাখা সম্বন্ধে সরল উপদেশ শুনেছিল, তার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দাঁতের যত্নের কথাও ছিল। আর এই শিক্ষা যে সাধারণ বিচারে যথেষ্ট সহজ ও স্পষ্ট ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে এই শিক্ষার দ্বারা শিশুটির মনে কতকগুলি তালপাকানো ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র। ঠিক কি কারণে যে এমন গোলমাল হ'ল, তা ভালরূপে বিশ্লেষণ করার সুযোগ হয়নি, করলে তার ফল বড় চিত্তাকর্ষক হত; এবং যে শিক্ষক স্বাস্থ্যের পাঠ দিয়েছিলেন, তাঁরও চিন্তার খোরাক হত।

মনোবিৎ শিশুদের মন যে দৃষ্টিতে দেখেন, সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করায় যে শুধু কোনও একটি শিশুর নিজস্ব প্রয়োজনের ব্যাপারই আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা নয়। শিশুদের মনোভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই বাড়ছে, তেমনই বিদ্যালয়ে ও বাড়ীতে তাদের কাছ থেকে মোটামুটি কতখানি চাওয়া যেতে, বা তাদের উপর কতটা চাপ দেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের ধারণাও অনেকাংশে উন্নত হচ্ছে। যেমন আজকাল ভাল শিক্ষাবিৎ মাত্রেই বুঝেছেন যে শিশুদের বসবার ব্যবস্থা আরামপ্রদ হওয়া চাই। শুধু যে তাদের দৈহিক গঠন এবং স্বাস্থ্যের জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে, তা নয়, তাদের অস্থিরতা ও দুষ্টামী দূর করবার জন্যও এর দরকার। তেমনই প্রগতিশীল শিক্ষকেরা আর ছেলেমেয়েদের জোর করেন না যে তারা তাদের স্মরণশক্তিকে যন্ত্রের মত চালিয়ে শব্দ, বানান, নাম প্রভৃতির দীর্ঘ তালিকা মুখস্থ করার ন্যায় কঠিন কর্ম্ম করুক। বরং তাঁরা সেগুলিই তাদের বুদ্ধি সহকারে

শিক্ষা করতে সাহায্য করেন, ফলে তারা শুধু যে আরও ভাল শেখে ও মনে রাখতে পারে, তা নয়, ভালভাবে বুঝতেও পারে। এইভাবে শিশুদের দক্ষতা, জ্ঞান, বোধ ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে যথার্থ সহায়তা কিসে হয়, সে বিষয়ে আমাদের আরও ভাল ধারণা হওয়ার ফলে, শিশুদের পাঠ দেবার রীতি এবং বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী আদর্শও নানা দিক থেকে বদলে গেছে।

আবার এখন বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে মাতৃভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতির যে পরিবর্ত্তন আসছে, সেক্ষেত্রেও এরই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আজকাল আমরা বুঝতে পারছি যে, শিশুদের লিখিত রচনা শেখাতে গেলে প্রথমে প্রথমে মুখে মুখে তাদের নিজ ভাব প্রকাশ করার অভ্যাস করাতে হবে। এই সুযোগ যদি তাদের আদৌ না দেওয়া হয়, তবে আমাদের অধ্যাপনা যতই ভাল হোক না, তাদের কাছ স্পষ্ট ও স্বচ্ছন্দ লেখা আশা করাই বৃথা। ছেলেদের লিখতে শেখার পক্ষে শ্রেণীতে মুখ বন্ধ ক'রে থাকার মত খারাপ আর কিছু নেই। যে ছেলেমেয়েদের শ্রেণীর মধ্যে অবাধে কথা বলতে উৎসাহ দেওয়া হয়, যে সমস্ত জিনিষে তাদের আগ্রহ, সেগুলির কথা বলা, গল্প বলা, বর্ণনা ও আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়, তারা শীঘ্রই সহজে সুন্দরভাবে ও উৎকৃষ্ট ভঙ্গীতে লিখতে শেখে ;. তা ছাড়া স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে চিন্তা করার অভ্যাসও হয়। দুই একটি উন্নতিশীল বিদ্যালয়ে এই সহজ সত্যটি এখন স্বীকৃত হচ্ছে, তাই তাঁরা মৌখিক ভাষার বিশুদ্ধ অনুশীলন ঠিকমত হওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

শিশুর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ফলে বিদ্যালয়ের কাজে কি প্রেরণা ও সহায়তা পাওয়া যায়, তারই সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত এইগুলি। আবার নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার বয়সের, অর্থাৎ সাত থেকে এগার বছরের শিশুর

মানসিক জীবনের কথা যখন আলোচনা করা হবে, তখন এর আরও উদাহরণ দেওয়া যাবে। এগুলির সাহায্যে শিক্ষক যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টি লাভ করবেন। যদি তিনি মাঝে মাঝে শ্রেণীকক্ষের উপস্থিত সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে, মনোবিদের দৃষ্টিভঙ্গীটি নিজস্ব করে নেন, তা হলে তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীগুলিকে মানুষ হিসাবে ঠিকমত বুঝতে পারবেন, আর তাঁর নিজের নৈপুণ্য ও নির্ভরযোগ্যতাও বাড়বে।

২। এক শিশুর নানা ভূমিকা

শৈশব ও বিদ্যালয়জীবনের যে অংশটি এই পুস্তকে প্রধানতঃ আলোচিত হবে, তা হচ্ছে সাত থেকে এগার বছর বয়স। এই বয়সটি নেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, এই বয়সের মধ্যেই শিশুরা নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ে। অবশ্য এখন যার বয়স সাত, অল্পকাল আগেই সে ছয় বছরের ছিল, আর এগার বছরের ছেলেটির বয়সও শীঘ্রই বার বছর হবে। অর্থাৎ ছেলে ত সারা বিদ্যালয়জীবন ধ'রে একই মানুষ, নার্সারি (nursery) বা বাল্যশ্রেণী থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্য্যন্ত ; তবে আমাদের সুবিধার জন্য এর এক একটি অংশের কথা আমরা পৃথকভাবে চিন্তা করে থাকি।

এখন স্বভাবতঃই একটি প্রশ্ন উঠবে। শিশুর জীবনকে এই যে নার্সারি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বয়সে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে, একি শুধু আমাদের কাজের সুবিধার জন্য, না শিশুর মানসিক বিকাশের দিক থেকেও এর কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে ?

এর প্রধান সার্থকতা যে কার্য্যকরী সুবিধা, সে কথা নিশ্চয়। ছয় এবং সাত বছরের ছেলে কিংবা এগার ও বার বছরের বালকের মনের

মধ্যে কোনও সূক্ষ্ম পার্থক্য রেখা টানা যায় না। তা আমরা জানি, এবং একথাও জানি যে, এই বিভিন্ন বয়সের শিশুগুলির ক্রমবৃদ্ধি বিদ্যালয়ের এক শ্রেণী থেকে উপরের শ্রেণীতে উঠার মত সুস্পষ্ট ধাপে এগোয় না। যেমন, যে ছেলেগুলি এখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে, তাদের মনের বৃদ্ধি ও পরিণতি সারা বছর ধ'রেই চলছে, ঠিক পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার সময়েই যে তাদের মন হঠাৎ অনেকখানি অগ্রসর হয়ে যাবে, এমন কথা ভাবা যায় না। আমরা সুবিধার জন্য শিশুদের বয়স ধ'রে এইরূপ পৃথক ভাগ করে নিয়েছি, এবং সেই অনুযায়ীই তাদের এক সময়ে উপরেও উঠিয়ে দেওয়া হয়, যদিও আমরা জানি যে তাদের মানসিক বিকাশ সমস্তক্ষণ অনেকটা স্থিরগতিতেই চলে। তেমনই তারা যখন সাত বছরে শিশুবিভাগের পাঠ সমাপ্ত ক'রে প্রাথমিক শ্রেণীর পড়া আরম্ভ করে, এবং তারপরে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিভাগে চলে যায়, তখনও এই একই কথা খাটে।

এ কথাটি আমাদের স্মরণ রাখা ভাল। কারণ অনেকের একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে যে, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাকাল হয় ত তার মানসিক পরিণতি এবং বিদ্যালয়ের পাঠের মধ্যে একটি পৃথক সুনির্দিষ্ট অংশ। সত্যই ছোটদের পড়াতে গিয়ে অনেক সময়ে আমরা যেন ধরে নিই যে শিশু সাত বছর বয়সে যখনই শিশুবিভাগ (Infants' department) ছেড়ে উপরের শ্রেণীতে উঠে, সঙ্গে সঙ্গেই তার বিশাল একটা মানসিক পরিবর্তন ঘটে যায়। শিশুবিভাগের সহজ আনন্দময় পরিবেশ ও ক্রিয়াচঞ্চল জীবনের পরই প্রাথমিক শ্রেণীর কঠোর, নীরস ও নিষ্ঠাগত ব্যবস্থার যে আকস্মিক পরিবর্তন, তার মধ্যে প'ড়ে আগেকার দিনে ছেলেমেয়েরা অনেক সময়ে বড়ই হতবুদ্ধি ও কাতর হয়ে পড়ত। সারা বিদ্যালয়জীবনে ছেলেমেয়েদের পক্ষে বাইরের দিক থেকে এইটিই

সব চেয়ে গুরুতর পরিবর্তন। এখন এই ব্যবস্থা ঠিক আগেকার মত নেই বটে। তবে অনেক স্থলেই আরও সংস্কারের প্রয়োজনও আছে।

শিশুর মনের দিক থেকে অবশ্য এ রকম পরিবর্তনের একটু কারণ আছে। ছয় সাত বছর বয়স হ'লে শিশু নিজে খানিকটা মনে করে যে তার বাল্যের ছেলেমানুষী শেষ হয়েছে, এখন তাকে অধিক দায়িত্বশীল, কঠিন কর্ম্ম ও উন্নত আচরণের যোগ্য ব'লে গণ্য করতে হবে। বেশ স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে শিশুদের শিক্ষা দেবার সুযোগ যাঁরই হয়েছে, তিনিই জানেন যে সাড়ে পাঁচ বছর বা ছয় বছর পার হ'লেই ছেলেরা ও মেয়েরা উভয়েই 'সত্যকার' বিদ্যালয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়, যেখানে তাদের খাটতে হবে, নিয়মিত কাজ শেষ করতে হবে এবং নিজেকে শাসনে রাখতে হবে। এই বয়সের যে শিশুরা কিণ্ডারগার্টেন শ্রেণীতে অথবা শিশুবিভাগে পড়ছে, নিজেদের বড় ভাইকে দেখে তাদের হিংসা হয়, কারণ তারা দেখে যে বড়গুলিকে দায়িত্বশীল ও বয়ঃপ্রাপ্ত বলে ধরা হচ্চে।

সুতরাং ছেলেমেয়েরা শিশুবিভাগ থেকে প্রাথমিক পর্য্যায়ে উঠলে যে আমাদের নিয়ম একটু কড়া হয়, ব্যবস্থা ও কার্য্যবিধি কঠোর হয়, শিশুরা নিজেদের মনোভাবেই তা নিঃসন্দেহে সমর্থন করে। তারা চায় যে এটা যথার্থই তাদের পরিবর্তন ও অগ্রগতি হোক।

তা হলেও শিশুশ্রেণী থেকে এসে ছেলেমেয়েগুলি যখন প্রাথমিক বিভাগে ভর্ত্তি হবে, তখন এই নতুন জগৎ তাদের কাছে একেবারে স্বতন্ত্র রকমের হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। এই নূতন ও পুরাতন জীবনের ক্রিয়া ও নিয়মের মধ্যে সংযোগ থাকা চাই। প্রাথমিক নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক, সুপরিচালিত শিশুবিভাগে যা কিছু ভাল আছে, সে সবই নিয়ে তাঁর নিজের শিক্ষার্থীদের নূতন প্রয়োজনে তা কাজে লাগাবেন।

কথা, আবৃত্তি, নাচগানের এখানেও যথেষ্ট সার্থকতা আছে। জিনিষ গড়ার আনন্দ, অভিনয়ের ভঙ্গী, খড়ি ও রঙ দিয়ে ছবি আঁকার মাধ্যমে শিশুর নিজ শক্তির অবাধ স্ফুরণ, এ সবকেই এই নূতন শিক্ষার উপযোগী করে নিয়ে এগুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে। শিশুদের কাছ থেকে আরও বেশী কাজ আদায় করা হবে বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে শিক্ষকের আগের মত সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটি বজায় না থাকার কোনও কারণ নেই।

নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার মাঝামাঝি যারা পৌছেছে, অর্থাৎ নয় দশ বছরের শিশু, এবং সাধারণ শিশুবিভাগের ছেলেমেয়ের মধ্যে অবশ্য প্রচুর পার্থক্য আছে। তেমনই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাধারণ শিশু ও মাধ্যমিক উচ্চ শ্রেণীর ছেলেমেয়েতেও যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যাবে। মানুষের বাল্যকাল থেকে পূর্ণ বয়সে উপনীত হওয়ার মধ্যে এগুলি এক একটি সুনির্দ্দিষ্ট স্তর বা পর্য্যায়। আর এই বিভিন্ন পর্য্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সাধনও শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন হয়।

তবে এই সঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই পর্য্যায়গুলির সীমারেখা স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায় না। কীটপতঙ্গের জীবনে যেমন সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়, শূক থেকে গুটিকার আবির্ভাব ঘটে, মানুষের ক্রমপরিণতিতে তেমন সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। শিশু যখন এক একটি পর্য্যায়ের মাঝামাঝি বয়সটিতে আসে, তখনই সেই পর্য্যায়ের নিজস্ব প্রয়োজন ও পরিণতির বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে। এই মানবশিশুর এক পর্য্যায় থেকে আর এক পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়ার ব্যাপারটি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চলে, হঠাৎ কোনও বদল হয় না, সে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে; তবেই আমরা শিশুর জীবনে পর পর এই পর্য্যায়গুলির বা নূতন নূতন ভুমিকাগুলির কথা ঠিকভাবে বুঝতে পারব।

শৈশবের সমগ্র পরিণতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পরিবর্ত্তন বা সঙ্কট আসে যখন শিশু মায়ের কোল ছেড়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। দাঁত উঠা, চলতে এবং কথা বলতে শেখার ফলে শিশুর অস্তিত্বে যে বদল এসে যায়, পরবর্ত্তী জীবনে আর কোনও ঘটনাতেই তা হয় না। এই পরিবর্ত্তনকে সঙ্কট বলা যাচ্ছে এই জন্য যে, এইখানেই শিশুর কোলে আবদ্ধ থাকার অবস্থা শেষ হয়। সে চারদিকে চলে ফিরে বেড়াতে আরম্ভ করে, তার জগতের সীমাটি যেন হঠাৎ বেড়ে যায়; আর আগের মত শুধু কাঁদাই নয়, এখন সে ভাবের আদান প্রদানও করতে পারে।

এর পরও কয়েক বৎসর কিন্তু প্রক্ষোভ বা ভাব অনুভূতির ব্যাপারে সে তার মা বাপ ও বাড়ীর লোকেদের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এইভাবে তার দুই থেকে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ নার্সারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার নির্দ্দিষ্ট বয়সটি কাটে। এই সময়ে সে সর্ব্ববিধ দৈহিক ভঙ্গী আয়ত্ত করে, জগতের নানা জিনিষের জ্ঞান লাভ করে, অনেক নূতন শব্দ ও কথা বলার ধরণ শেখে। পাঁচ ছয় বছর বয়সে তার শৈশবের যেন একটা স্থিতিশীল অবস্থা আসে। তখন বাড়ীর বাইরের জিনিষ ও মানুষের প্রতি তার আগ্রহ আরো সহজে হয়, এবং সে আর বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবকদের উপর অতখানি নির্ভরপরায়ণ থাকে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিশুর বিদ্যালয়ে পড়ার কালটি যেমন নার্সারি, শিশুশ্রেণী, প্রাথমিক প্রভৃতি পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, শিশুর মনের বিকাশের মধ্যে তদনুযায়ী সুস্পষ্ট বিভাগ করা চলে না। পড়াশুনার এই বিভাগগুলি অনেকটা ঘটনাচক্রেই হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। ঠিক কত বছর বয়সে শিশুর খানিকটা স্বাধীনতা জাগে, সে বিষয়ে বিভিন্ন শিশুর মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়;

মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে এই অবস্থা আসে। সুতরাং শিক্ষার সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হ'ল এই যে, পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের জন্য নির্দ্দিষ্ট শিশুশ্রেণীতেও নার্সারি বিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে হবে, সেই সঙ্গে প্রতি বছরই একটু একটু ক'রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পদ্ধতিরও সূচনা করতে হবে।

কোলের শিশু প্রকৃত শৈশবে পদার্পণ করার পর, আবার বয়ঃ-সন্ধি (puberty) পর্য্যন্ত কোনও খুব সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন নজরে পড়ে না, যদিও অবশ্য কোনও না কোনও দিকে কিছু পরিবর্ত্তন সারাক্ষণই চলতে থাকে। এই বয়ঃসন্ধির লক্ষণগুলির প্রথম আরম্ভ ঠিক কি বয়সে হবে, তাও ভিন্ন ভিন্ন ছেলেমেয়ের বেলায় বিভিন্নরূপ ; তবে আন্দাজ বার থেকে তের বছরের মধ্যে এর সময়টি ধরা যেতে পারে। বয়ঃসন্ধি হচ্ছে বালক বালিকার যৌন পূর্ণতা পাওয়ার সূচনা, তবে সূচনাই মাত্র। দেহ এবং মনের পরিণতি সম্পূর্ণ হতে আরও অনেক বছর লেগে যায়। এই সময়টিকে আমরা কৈশোর (adolescence) বলি।

সুতরাং শিশু যে বয়সে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, সাত থেকে এগার বছর পর্য্যন্ত এর প্রত্যেক বছরটির সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে খুব নজরে পড়ার মত কোনও পরিবর্ত্তন তার দেহে বা মনে হয় না। এই বয়সটির পূর্ব্বে ছিল মাতৃক্রোড় ছাড়বার পরবর্ত্তী আসল শৈশবাবস্থা, এবং পরে আছে বয়ঃসন্ধি। সুতরাং এই ব্যাপার থেকেও বোঝা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচীর সঙ্গে, তার পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী, এই উভয় ব্যবস্থারই ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। আর এই দুইয়ের মধ্যে প্রথম দিকের যোগসূত্রটিরই গুরুত্ব বেশী। সেইজন্য শিশু যখন সাত বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, সেই সময়ে তার শিক্ষাজীবনে ও

ক্রিয়াকলাপে হঠাৎ একটা বড়গোছের বদল এনে ফেলা একেবারেই উচিত নয়। বরং নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার শেষদিকে, এগার বছর বয়সে এই ধরণের পরিবর্ত্তন হলে শিশুর পক্ষে ভাল হয়, কারণ সে পরিবর্ত্তন ঠিকমত হলে এই বয়সে নূতন প্রেরণা ও শক্তি এনে দিতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক বিভাগের পড়া যে ছেলে সবে আরম্ভ করেছে, তার সঙ্গে শিশুবিভাগের উপর দিকের শিশুর বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। তার দেহ ও মনের প্রয়োজনগুলি প্রায়ই একরূপই আছে। সুতরাং এই নূতন পাঠের প্রথম দুই এক বৎসর সুফল পেতে গেলে শিশুশ্রেণী ও প্রাথমিক এই দুই বিভাগের মধ্যে অবাধ সহযোগিতা রাখতে হবে, উভয়কেই পরস্পরের লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তিগত পার্থক্য

১। নানা প্রকৃতির শিশু

বিভিন্ন বয়সের যে সমস্ত শিশু বিভিন্ন পর্যায়ের বিদ্যালয়ে শিক্ষা পায়, তাদের মানসিক বৈশিষ্ট্যে কয়েকটি স্থূল পার্থক্য দেখা যায়, তা পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়সে, অর্থাৎ সাত থেকে এগার বছরের মধ্যে, কি ধরণের পরিণতি হতে থাকে, সে সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

কিন্তু তার আগে আর একটি ব্যাপার ভাববার আছে। সেটি হ'ল এক শিশু এবং অন্য শিশুর মধ্যে পার্থক্যের কথা। আমরা সবাই জানি যে কোনও এক বয়সের বিভিন্ন শিশুদের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ দেখা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু কেবল একটা কথার কথা, এর দ্বারা শিক্ষার সাধারণ বিধান রচনারই সুবিধা হয় মাত্র। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে একই বয়সের কয়েকটি ছেলেমেয়ের মধ্যে মিল যতটুকু আছে, পার্থক্যও প্রায় ততখানিই রয়েছে। তিনটি শিশুকে দেখা গেল, রমেশ কমলা আর দীপু; প্রত্যেকেরই বয়স ঠিক দশ পূর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে রমেশ শীর্ণাকার ও ক্ষুদ্রকায়, আর লেখাপড়াতেও পিছিয়ে থাকে। কমলা খুব চটপটে, বেশী কথা বলে, কিন্তু তার কথায় নির্ভর করা যায় না। আর দীপু স্থিরবুদ্ধি, কর্তব্যকর্মী, সে বুঝি পাবার চেষ্টা করছে। এই ক'টি শিশুর শক্তি ও স্বভাবের মধ্যে একখানি ব্যবধান থাকার ফলে তাদের এক শ্রেণীতে রেখে একই পদ্ধতিতে পড়ানও বড়

কঠিন। রমেশ যে নিজ শ্রেণীর সঙ্গে সমান তালে চলবে, সে আশা করে লাভ নেই, অথচ দীনু অনায়াসেই অনেকখানি এগিয়ে যায়। আবার কমলার অস্থিরতা ও দুষ্টামী দেখা দেয়; কারণ শ্রেণীর সব শিশুর প্রয়োজন যাতে মেটে, সেই শিক্ষায় তার মন বসে না।

রমেশ, কমলা এবং দীনুর মধ্যে এই যে পার্থক্য তাদের শিক্ষক দেখছেন, তার মূলে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর কারণ একসঙ্গে রয়েছে। প্রথম, এবং খুব সম্ভব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, শিশুতে শিশুতে নিজস্ব জন্মগত শক্তির পার্থক্য। এই শক্তির সীমা যে কিরূপ সুনির্দ্দিষ্ট, তা আমাদের চোখে পড়বে, যে সব অল্পবুদ্ধি ছেলেদের বিশেষ বিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য বেছে নেওয়া হয়, তাদের বেলায়। আমরা জানি যে, অতি সুদক্ষ অধ্যাপনাতেও এই সমস্ত ছেলেমেয়ের শিক্ষার মান একটি স্বাভাবিক বুদ্ধির সাধারণ শিশুর সমান করা যাবে না। তেমনই সাধারণ শিশুর বুদ্ধিরও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী রয়েছে। সুখের বিষয় এই যে সে সীমা আরও অনেক উন্নত ও বিশাল, কিন্তু তবু তার বিস্তার শিশুর সহজাত মানসিক শক্তির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিশুর বুদ্ধির উৎকর্ষ যদি খুব বেশীও হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তার প্রকৃতি এবং চরিত্রে অন্য কতকগুলি বিশেষ গুণ না থাকে, তবে সে তার বুদ্ধির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তার কাজে অধ্যবসায় না থাকে, উদ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষায় স্থিরতা না হয়, বা যদি বিদ্যালয়ে গিয়ে সে কু-অভ্যাস শেখে, তবে তার নিজস্ব মেধা তাকে শিক্ষায় ও কর্ম্মে খুব বেশী দূর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। বরং বুদ্ধিমান অথচ অস্থির শিশুর চেয়ে, যে শিশুর বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু স্থৈর্য্য ও কাজের আগ্রহ বেশী, সে অনেক সময়ে বিদ্যালয়ে ও পরবর্ত্তী জীবনে অধিক উন্নতি করে। যারা সব চেয়ে উপরে উঠে,

তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ত থাকেই, সেই সঙ্গে অধ্যবসায়, স্থিরতা এবং অবিচলিত লক্ষ্যও থাকে।

এই বয়সের যে কোনও একদল শিশুর মধ্যে বিবিধ রকমের স্বভাব ও সামাজিক গুণ দেখা যায়; হাসিখুসী ও সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ, চঞ্চল ও প্রগল্ভ, অলস ও স্থূল, ধূর্ত্ত এবং দুষ্ট, উৎসাহী, বাধ্য এবং স্থির। যত রকমের প্রকৃতির একত্র সমাবেশ হোক না কেন, কুশলী শিক্ষক তাদের সব কটিকে ভাল করে চিনে নেন; এবং শ্রেণীর কার্য্য যাতে নির্ব্বিঘ্নে চলে, সেই ভাবেই প্রত্যেকটি শিশুকে তিনি চালান। উন্নতির সাধারণ মান যথাসম্ভব উচ্চ রাখতে গেলে আবার প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব অভাবও পূরণ করতে হয়।

তৃতীয় যে কারণে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য হয়, সেটি হচ্ছে তাদের বাড়ী ও সামাজিক আবেষ্টন। শিক্ষকতা যিনি করেছেন, তিনিই ভালরূপে জানেন যে, শিশুর বিদ্যালয়ের পড়াশুনা তার বাড়ীর পরিবেশ প্রভাবের উপর কতখানি নির্ভর করে। একটি শিশু এমন বাড়ী থেকে এল যেখানে বই, আলাপ আলোচনা আছে, বেড়ানো, আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে, শিশুর বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধে, বিদ্যালয়ের পড়াশুনা সম্পর্কে, মা বাবার আগ্রহ রয়েছে। আর একটি শিশু হয়ত আসছে প্রায় নিরক্ষর এক পরিবার থেকে। অন্য একজন থাকে জনবহুল বস্তীর এক ঘরে, যেখানে তার শৈশবের কোনও অভাবের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। আর এই অবস্থাগুলির মাঝামাঝি, ভাল ও মন্দের, সুবিধা ও অসুবিধার, বহু প্রকারভেদ দেখা যায়। এই সব কথা বিবেচনা করলে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার যে বিশাল তারতম্য দেখা যায়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু থাকে না।

কোনও ছেলে আনন্দ পাবার জন্য বা জানবার জন্য আপনা হতেই

বই নিয়ে বসে। আবার আর একজনের কখনও মনেই হয় না যে বিদ্যালয়ের বাইরে বই বলে কিছু থাকতে পারে। অন্য আর একটি ছেলের কাছে বইয়ের কোনও মূল্যই নেই, অপর একজন কোনও কালেই বুদ্ধির সঙ্গে বইয়ের সদ্ব্যবহার করতে শিখবে না। প্রথম ছেলেটি তার শিক্ষা আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই অনেক শব্দ শিখে নেয়, নানাভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে পারে, মৌখিক ও লিখিতভাবে সহজেই নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে। আর একটি ছেলে বিদ্যালয়ে এসে ভদ্রভাষায় কথা বলা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেয়, কিন্তু সে ভাষা তার কাছে যেন বিদেশী ভাষাই থেকে যায়, তার স্থান শুধু বিদ্যালয়ে ; বাড়ীতে বা পথে পথে ঘুরে বেড়াবার সময়ে তার সঙ্গে কোনও সংস্রব থাকে না। আবার অন্য আর একটি ছেলের শব্দের জ্ঞান বরাবর অল্পই থেকে যায়, সেগুলির ব্যবহারও সে ঠিকমত করতে পারে না, তার কারণ তার স্বভাবের ত্রুটি, না গৃহের হীন পরিবেশ, শিক্ষকের পক্ষে তা বুঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

যে ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে পুস্তক, আলোচনা ইত্যাদির সুযোগ আছে, তাদের বিদ্যালয়ের পড়াতেও, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে এই বিস্তৃত সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তি তাদের সহায়ক হয়। এই সুবিধার ফলে, যদি তাদের বুদ্ধি ও যোগ্যতা থাকে, তবে তাহারা সহজেই এই বিষয়গুলিতে এগিয়ে যায়। যে ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি কম বা বাড়ীর অবস্থা মন্দ, তাদের তুলনায় এই শিশুগুলির স্বাভাবিক আগ্রহ অনেক অধিক ও বহুমুখী হয়। তারা বিদ্যালয়ে যে জ্ঞান লাভ করে, তা পৃথক কোটরবদ্ধ অবস্থায় থাকে না। তারা সহজেই এক বিষয় ও অন্য বিষয়ের মধ্যে, ইতিহাস ও ভূগোল, হাতের কাজ এবং পাটীগণিত বা জ্যামিতির মধ্যে পরস্পর যোগসূত্রটি দেখতে পায়।

সুতরাং প্রত্যেকটি বিষয় শেখবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাধারণ বোধও অনেকখানি বেড়ে যায়। কিন্তু যে ছেলের সহজাত শক্তি কম, যার কাছে প্রত্যেকটি বিষয় আলাদা, জোর করে দেখিয়ে না দিলে সেগুলির পরস্পর সম্পর্ক যার চোখে পড়ে না, অথবা যে ছেলের বাড়ীতে শিক্ষার অভাব, সুতরাং লেখাপড়ায় আগ্রহ জন্মাবার সুযোগ নেই, সেই সব শিশুদের এই উন্নতি হয় না।

সুতরাং যে ছেলে বুদ্ধিমান, কিংবা যে প্রত্যহ বাড়ীতে বই, খবরের কাগজ, কথাবার্ত্তার মধ্যেও খানিকটা শেখে, বিদ্যালয়েও তার অধিক কৃতিত্ব দেখা যায়। তাকে অত যত্নে একটু একটু করে শেখাতে হয় না, এগিয়ে চলবার জন্য বারংবার তাড়া দিতেও হয় না।

যে শিশুগুলিকে আমরা পড়াই, তাদের মধ্যে এই সামাজিক, স্বভাবগত ও স্বকীয় সামর্থ্যগত পার্থক্যের প্রভাব নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। তার ফলে শিক্ষকের কাজটি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, যদি না বিদ্যালয়ে ছেলেদের বেছে নেবার এমন কোনও পদ্ধতি চলিত হয়, যাতে একই শ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে প্রভেদ খুবই অল্প থাকে।

এই জন্য শিক্ষার উন্নতদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থাপকগণ মনে করেন যে, শিশুদের এক একটি শ্রেণীর উপযুক্ত ভাবে বেছে নেওয়ার জন্য মুখ্যতঃ তাদের সহজাত বুদ্ধির উপরই নির্ভর করা দরকার। এটি যা থেকে বোঝা যায়, তাকে বলে শিশুর 'মানসিক বয়স' (mental age), পরবর্ত্তী অংশে তার কথা বলা যাবে। এক শিশু ও অপর শিশুর মধ্যে যত রকমের পার্থক্য দেখা যায়, তার মধ্যে এই সহজাত বুদ্ধির প্রভেদই সব চেয়ে স্থির ও স্থায়ী। বিদ্যালয়ে ও কর্ম্মজীবনে সাফল্যের পক্ষে এর গুরুত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যদি ছাত্রের একটুও বুদ্ধি না থাকে, প্রাণশক্তির সরসতা না থাকে, তবে জগতের সব চেয়ে সেরা অধ্যাপনা

থাকলেও কোনও ফল হয় না। আবার একই শ্রেণীতে খুব চালাক এবং খুব বোকা ছেলেকে একসঙ্গে ঠিকভাবে পড়ান যায় না।

অবশ্য শ্রেণীবিভাগ করার সময়ে শুধু সহজাত শক্তির কথা ভাবলেই চলে না। শিশুগুলির প্রকৃত বয়স, বাড়ীর অবস্থা, স্বভাব, এ সবের প্রভেদও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যাঁরা শিশুদের জন্মগত বা আসল বয়স না ধরে প্রধানতঃ মানসিক বয়স অনুসারে শ্রেণীগঠন করেছেন, তাঁরাই দেখতে পেয়েছেন যে পৃথকভাবে শিশুগুলির এবং সমগ্রভাবে বিদ্যালয়ের কাজও অনেক ভাল হয়েছে। এরূপ শ্রেণীবিভাগেই প্রত্যেক ছেলেমেয়ের নিজ প্রয়োজন সুসাধিত হওয়া সম্ভব।

২। শিশুদের পার্থক্যের মান নির্ণয়

শিশুদের সহজাত শক্তির এই যে পরস্পর প্রভেদ, এর সমস্যাটি শিশু-বিভাগ কিংবা উচ্চ বিদ্যালয়ের চেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়েই, বিশেষতঃ তার প্রথম কটি বছরে, অনেক বেশী সঙ্গীন। শিশুশ্রেণীতে এই সমস্যা তত গুরুতর নয়, কারণ সাত বছর বয়সের আগে ছেলেদের মধ্যে তত বেশী পার্থক্য দেখা যায় না। আমরা যদি ছয় বছরের এবং দশ বছরের সকল শিশুর সামর্থ্যের মান নির্ণয় করতে পারি, তা হ'লে দেখব যে দশ বছরের ছেলেদের বেলায়ই পার্থক্যের পরিমাণ অধিক। ছয় বছরের শিশুগুলির তুলনায়, এদের নির্বোধ ছেলেগুলি সাধারণ মানের অনেক পিছনে আছে, আবার মেধাবী ছেলেরা ঢের বেশী এগিয়ে রয়েছে।

আবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপর দিকের ছেলেমেয়েদের যদি লক্ষ্য করা যায়, তা হ'লে দেখা যাবে যে কোনও এক শ্রেণীর শিক্ষার্থী-গুলি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় শ্রেণীর সাধারণ মানটির বেশী কাছ ঘেঁসে রয়েছে। অর্থাৎ শ্রেণীর গড় মানসিক বয়স যত, তার সঙ্গে

প্রত্যেক ছেলেমেয়ের পৃথক মানসিক বয়সের তারতম্য প্রাথমিক শ্রেণীর চেয়ে কম। অবশ্য শিশুবিভাগের এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলেদের বেলায় এই যে একই ব্যাপার আমরা দেখছি, তার কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। আসলে যদি আমরা নানা বিদ্যালয় থেকে ও সব রকমের বিদ্যালয় থেকে বহু সংখ্যক বেশী বয়সের ছেলে নিয়ে পরীক্ষা করতে পারতুম, তা হলে দেখতুম যে তাদের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানিই আছে, দশ বছরের ছেলেদের তুলনায় বরং বেশী। তার কারণ, বুদ্ধি এবং লেখাপড়ায় উন্নতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ছেলের পার্থক্যের আসল পরিমাণ বয়স বাড়ার সঙ্গে বেড়েই চলে। কিন্তু কোন না কোন উপায়ে এগার বছর ও তার বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা মোটামুটি তাদের শক্তি অনুযায়ী সমান শ্রেণীতে পড়ে যায়। কারণ, যারা বরাবর পড়ায় পিছিয়ে থাকত, তাদের অনেকেই ক্রমশঃ ছেড়ে গেছে ; সুতরাং যারা থেকে যায়, তারা এক রকম বাছাই করা সমান দরের ছেলে, এ কথা বলা যেতে পারে।

সেই জন্যই এরূপ বাছাই হওয়ার পূর্ব্বে, শিশুরা যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকে, তখন তাদের শিক্ষককে একই শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে এত বিপুল পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের ঝঞ্ঝাট সামলাতে হয়। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থার কর্ণধার যাঁরা, তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য হল শিশুদের শ্রেণী-বিভাগের এমন কোনও পদ্ধতি আবিষ্কার করা, যার ফলে একই শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে পার্থক্য খুব কমে যাবে ; তবেই শ্রেণীর শিক্ষকের কাজের এই মহা অসুবিধা দূর হবে।

তা হলে এমন এক ধরণের পরীক্ষা আমাদের দরকার, যার সাহায্যে আমরা এক শিশু ও অন্য শিশুর কেবল সহজাত শক্তিটুকুর প্রভেদটা ঠিকমত ধরতে পারব ; অথচ তাদের বাড়ীর অবস্থা, বিদ্যালয়ে অর্জিত

জ্ঞান, পড়াবার ভাল বা মন্দ পদ্ধতির তারতম্যেও আমাদের পরীক্ষার ফলে, অর্থাৎ শিশু দুটির নিজস্ব শক্তির পার্থক্য নির্ণয়ে, কোনও ব্যতিক্রম হবে না। কারণ, একথা ত স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সুশিক্ষিত পরিবার থেকে যে ছেলে এসেছে, উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছে, সাধারণ প্রণালীতে পরীক্ষা করলে, যে ছেলে এসব সুযোগ পায়নি, তার চেয়ে সে অধিক কৃতিত্ব দেখাবে; অথচ তা সত্ত্বেও শুধু স্বকীয় শক্তির পরিমাণ দ্বিতীয় ছেলেটির প্রথমটির চেয়ে কম ত নয়ই, বরং বেশীও হতে পারে।

এই সমস্যাটি কার্য্যকরীভাবে যাঁরা সর্ব্বপ্রথম বিবেচনা করে-ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ফরাসী মনোবিৎ আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet)। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি সহজ ও সাধারণ ধরণের প্রশ্ন উদ্ভাবন করলেন। প্রশ্নগুলি সব নানা রকমের ও বিভিন্ন মানের, আর এমন সব বিষয় সেগুলিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, সমস্ত স্বাভাবিক শিশু, তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ থাক আর নাই থাক, আপনা হতেই সচরাচর সেগুলি শিখে নেয়। এই সমস্ত প্রশ্ন বহু সংখ্যক শিশুর উপর প্রয়োগ ক'রে তিনি দেখতে পেলেন যে প্রত্যেকটি প্রশ্ন উত্তর করতে পারার একটা ন্যূনতম বয়স আছে, যে বয়সের বেশীর ভাগ শিশুই প্রশ্নটির ঠিক জবাব দিতে পারে। সুতরাং তিনি ভিন্ন ভিন্ন বয়স অনুসারে প্রশ্নগুলির শ্রেণীবিভাগ ক'রে সাজিয়ে নিলেন। এইভাবে শিশুর বিদ্যালয়জীবনের প্রত্যেকটি বছরের জন্য এক এক প্রশ্নমালা রচিত হ'ল। এই প্রশ্নসমূহের নাম মানসিক অভীক্ষা প্রশ্ন (mental tests), এগুলি দ্বারা প্রস্তুত হল বুদ্ধির মানদণ্ড (scale of intelligence)। বিনের এই মানদণ্ড ১৯০৮ সালে প্রথম বেরোয়। তাঁর পরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বহু মনোবিৎ পণ্ডিত এই সমস্যায়

মনোযোগ দিয়েছেন ও সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন শিশুর বুদ্ধির তারতম্য নির্ণয় করবার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার বয়সের শিশুদের বেলায় বিনের অভীক্ষারই সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রচলন হয়েছে, এবং সাধারণভাবে এগুলির সাফল্যও সব চেয়ে বেশী দেখা গেছে। অভীক্ষাগুলি কিন্তু এখন আর তাদের সেই প্রথম আকারে নেই। বিনে নিজে এবং তাঁর সহকর্ম্মী সিম (Simon), প্রথমে যে অভীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল, তার সংশোধন করেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ গবেষক টার্ম্যান (Terman) এগুলির অনেক পরিবর্দ্ধন ও উন্নতিসাধন করেন ; যাঁরা অভীক্ষা ব্যবহার করেন, তাঁরা সে সব গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশেও অভীক্ষার বিধিমত অনুশীলন আরম্ভ হয়েছে। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রগামী, তাঁরাই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ও সেই সঙ্গে হিন্দী, গুজরাটী ও অন্যান্য ভাষায় উপরের অভীক্ষাবলীর প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তিত অনুবাদ করেছেন, এবং নূতন অভীক্ষাও রচনা করেছেন। নানা বিশেষ ধরণের অভীক্ষা এঁরা প্রস্তুত করেছেন, আর বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী কর্ম্মী নির্ব্বাচনের ব্যাপারে ও শিশুদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁদের পরিচালিত অভীক্ষা ও তদনুযায়ী উপদেশ বড়ই মূল্যবান ও সুফলদায়ক হয়েছে। এই ধরণের প্রচেষ্টা এখন অন্যান্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও মনোবিদ্যা গবেষণাগারগুলিতেও চলছে। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অভীক্ষার ব্যাপক প্রচলনের ব্যবস্থা এখনও কিছু হয় নি।

সাধারণভাবে এই অভীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু বুদ্ধিটুকুর মান নির্ণয় করা ; অর্থাৎ শিশু কি বা কতখানি জানে তার পরীক্ষার চেয়ে, সেই জ্ঞান সে কি ভাবে কাজে লাগাতে পারে সেটি পরীক্ষা করাই এর লক্ষ্য। কিন্তু শূন্যতায় ত বুদ্ধি মাপা যায় না, তাই শিশুকে কতকগুলি প্রশ্ন বা

সমস্যা দেওয়া হয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রত্যেক বয়সের নির্দ্দিষ্ট সমস্যাবলী এমন যে, সেগুলি সমাধান করবার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জ্ঞানটুকু সেই বয়সের সব শিশুরই সাধারণতঃ হয়ে থাকে, না হলে বুঝতে হবে সে বড়ই বুদ্ধিহীন। দু একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। নয় বছরেয় যে শিশু মোটামুটি শিক্ষা পেয়েছে, তাকে তিনটি জানা শব্দ দিলে তার দ্বারা সে বাক্য রচনা করবে। আট বছরের ছেলে তার পরিচিত দুটি ফলের, যেমন আপেল ও কমলালেবুর সাদৃশ্য কি, তা বলতে পারবে। কিংবা তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, দৈবাৎ অপরের কোনও জিনিষ তার হাতে ভেঙে গেলে সে কি করবে, তারও একটা বুদ্ধিসঙ্গত জবাব সে দেবে। দশ বছরের ছেলেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে এই কথাটিতে অসম্ভব কি আছে, "আমি একহাতে তলোয়ার আর এক হাতে পিস্তল নিয়ে এই চিঠিখানি লিখছি!" তা সে বুঝিয়ে দিতে পারবে। এইগুলি তারা না পারলে বুঝতে হবে যে তাদের বুদ্ধি কম, কেননা নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার যে শক্তি বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত, সে শক্তির তাদের অভাব রয়েছে। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে শিশুকে এই সব সমস্যার একটি মাত্র দিয়েই পরীক্ষা করা হয় না; কি ধরণের প্রশ্নের সমাধান তাকে করতে হয়, তারই উদাহরণ স্বরূপ শুধু এগুলির কথা বলা গেল।

শিশুটি যদি খুব পশ্চাৎপর ও অশিক্ষিত পরিবারের ছেলে হয়, কিংবা তার বাড়ী হয় বহুদূরস্থ এক অজ পাড়াগাঁয়ে, যেখানে কোনরূপ বিদ্যালয়ের শিক্ষা দূরে থাক, সভ্য জীবনের কোনও সাধারণ সুযোগ সুবিধাই নেই, সেক্ষেত্রে এই ধরণের অভীক্ষাতে কাজ হবে না। এরূপ শিশুদের জন্য অন্য ধরণের অভীক্ষা রচিত হয়েছে। কিন্তু যে সব সাধারণ ছেলে উপযুক্ত বয়সে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, তাদের সকলের

ক্ষেত্রেই তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কতখানি সদ্ব্যবহার তারা করতে পারে, অভীক্ষাপত্রগুলির সাহায্যে তা নির্ণয় করা যায়।

উপরে যে কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেছে, তা থেকে দেখা যায় যে, অভীক্ষা প্রশ্নগুলিতে বিস্তারিত, গূঢ় বা অদ্ভুত কিছুই নেই। শিশুরা তাদের জীবনে যে সব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে রয়েছে, প্রশ্নগুলির অধিকাংশই সেই ধরণের। যে কোনও ব্যক্তি শিশুকে সুচিন্তিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তার সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অভীক্ষার মানদণ্ডের একমাত্র প্রভেদ এই যে অভীক্ষার মান নির্দ্দিষ্ট। এই কথার অর্থ কি, তা পূর্ব্বেই বলা গেছে, যে নানা বয়ঃক্রমের শিশুকে একই অবস্থায় রেখে পরীক্ষা ক'রে, এবং এক একটি বয়সের শিশুরা প্রশ্নগুলির উত্তর কিরূপ দেয়, তারই গড় সাফল্য নিরূপণ ক'রে প্রত্যেকটি প্রশ্নের বয়সগত মান স্থিরীকৃত হয়েছে। তাছাড়া, একটি প্রশ্নে শিশুর সাফল্য বা অসাফল্যের সঙ্গে অন্য প্রশ্নগুলিতেও সাফল্য বা অসাফল্যের সম্পর্ক কতখানি, তাও নির্ণয় করা হয়েছে। আবার শিশুর শিক্ষক তার বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ও ফলাফল দেখে তার সামর্থ্য সম্বন্ধে যে অভিমত দিয়ে থাকেন, তার সহিত এই অভীক্ষার ফল কতখানি মেলে, তাও বিচার ক'রে দেখা হয়েছে।

এইভাবে, যত দিক থেকে শিশুর সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য পাওয়া যায়, সে সবেরই উপযুক্ত ব্যবহার ক'রে এই অভীক্ষার মানদণ্ড গঠিত হয়েছে। শৈশবের প্রত্যেকটি বছরের মানসিক বিকাশের পরিমাণ বেশ নির্ভর-যোগ্যভাবেই আমরা এ থেকে জানতে পারি। যখন কোনও মনোবিৎ বলেন যে অমুক বয়সের ছেলের অমুক অমুক অভীক্ষায় সফল হওয়া চাই, তার তাৎপর্য্য এ নয় যে নীতি বা শিক্ষার দিক থেকে এই সাফল্য বাঞ্ছনীয়। বরং তিনি এই কথাই বলতে চান যে, ঐ বয়সের খুব বৃহৎ

সংখ্যক শিশুকে কোনরূপ গুণাগুণ বিচার না ক'রেই যদি জড় করা যায়, তাদের অধিকাংশ, মোটামুটি শতকরা ৭০ ভাগ, সেই অভীক্ষায় কৃতকার্য্য হবে। এই সূত্রে মনোবিদেরা মানসিক বয়স শব্দটি ব্যবহার করেন। কোনও শিশুর মানসিক বয়স বলতে তার প্রকৃত বয়স যাই হোক না কেন, সে সর্ব্বোচ্চ যত বছরের অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই বয়সটি বোঝায়। সুতরাং যে ছেলেটির আসল বয়স আট বছর, সে যদি মানদণ্ডের আট বছরের অভীক্ষাগুলিতে সফল হয়, তা হ'লে বলা যাবে যে তার জন্মগত বয়স ও মানসিক বয়স সমান। যদি সে দশ বছরের অভীক্ষাগুলিও পারে, তার মানসিক বয়স ধরা হবে দশ বছর ; আবার যদি সে নিজের আট বছরের নির্দ্দিষ্ট অভীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়, শুধু কেবল সাত বছরের অভীক্ষাগুলিতেই উত্তীর্ণ হয়, তবে তার মানসিক বয়স হবে মাত্র সাত। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, কোনও এক বয়সের মেধাবী শিশুগুলি অধিক বয়সের অভীক্ষার উত্তর দিতে সক্ষম হবে ; তাদের মানসিক বয়সও হবে তাদের আসল বয়স অপেক্ষা বেশী। আর নির্ব্বুদ্ধি ছেলেদের বেলায় এর ঠিক বিপরীত দেখা যাবে। এই মানসিক বয়সের সাহায্যেই এক শিশু এবং অন্য শিশুর বুদ্ধিগত তারতম্য বোঝাতে সব চেয়ে সুবিধা হয়।

এর চেয়ে আরও প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্য্যপূর্ণ আর একটি মান আছে, তার নাম মানসিক অনুপাত (mental ratio), অথবা বুদ্ধির অঙ্ক বা বুদ্ধ্যঙ্ক (intelligence quotient)। এটি হ'ল মানসিক বয়স ও জন্মগত বয়সের অনুপাত অঙ্কের শতকরা হার ; যেমন যদি কোনও পাঁচ বছরের শিশুর মানসিক বয়স হয় ছয় বৎসর, তার বুদ্ধ্যঙ্ক হ'ল ১২০। শিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দুটি ছেলের যদি প্রকৃত বয়সের তফাৎ থাকে অথচ মানসিক বয়স এক হয়, তবে তাদের

মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকবে। যেমন ধরা যাক, দুটি ছেলে আছে, একটির জন্মগত বয়স দশ বছর, অন্যটির মাত্র ছয়, কিন্তু মানসিক বয়স দুজনেরই আট বছর, এক্ষেত্রে প্রথমটির বুদ্ধির অঙ্ক মাত্র ৮০, দ্বিতীয়টির ১৩৩। প্রথম ছেলেটি প্রায় অল্পবুদ্ধির (backward) সীমায় এসে পড়ে ; কিন্তু দ্বিতীয়টির বুদ্ধি উচ্চ পর্য্যায়ের, সে বিদ্যালাভে ও কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাবে, এমন আশা করা যায়। এই বুদ্ধ্যঙ্কের ভিত্তিতে মনোবিদ্‌গণ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি কুশলতার বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেন ; একদিকে আছে প্রতিভাশালী ও মেধাবী, অন্যদিকে নির্ব্বোধ ও জড়বুদ্ধি (mentally deficient) শিশু।

এই যে নীরস তথ্যগুলি আলোচনা করা গেল, বাস্তবক্ষেত্রে সত্যিকারের শিশুদের আচরণে এগুলির সার্থকতা কি, তাই এখন আমাদের দেখতে হবে। যে সব শিশুদের মানসিক অনুপাতে প্রভেদ রয়েছে, তাদের পড়াবার সময়ে আমরা তাদের কাছ থেকে যে বিভিন্ন রকমের সাড়া পাই, তা ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে মানসিক অনুপাত বা বুদ্ধির অঙ্ক কথাটির বিরাট তাৎপর্য্য প্রকৃতরূপে বুঝতে পারব। কিন্তু তার পূর্ব্বে একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার।

এই অভীক্ষাগুলিকে দেখতে সাধারণ হলেও এর কার্য্যকরী প্রয়োগ অতি সুদক্ষ বিশেষজ্ঞের কাজ। অভীক্ষাতে শিশুর সাফল্যের পরিমাণ নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে হ'লে অভীক্ষা প্রয়োগের প্রণালী এবং সর্ব্ববিধ সাধারণ ব্যবস্থা, যতগুলি শিশুর অভীক্ষা নেওয়া হয়েছে, সকলের বেলায় সম্পূর্ণ এক হওয়া আবশ্যক। শিশু শুধু নিজের চেষ্টায় কতখানি ভাল করতে পারে, তা দেখতে হবে, কিন্তু তাকে কোনরূপ ইঙ্গিত বা সহায়তা দেওয়া চলবে না। সকলে বোধ হয় বুঝতে পারেন না যে এই কার্য্য ঠিকভাবে করতে গেলে বিশেষজ্ঞের শিক্ষা চাই। ঠিক কোন্ স্থলে

ছোট ছোট ভুল হয়, আর কিভাবে সেগুলি এড়িয়ে চলা যায়, তা জানতে দীর্ঘ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষা না নিয়ে সখ করে যদি কেউ অভীক্ষা প্রয়োগ করতে যান, তবে অভীক্ষার ফলে ভুল থাকবে, আর তার মূল্যও কিছুই হবে না।

সুতরাং যাঁর মানসিক অভীক্ষার উপযুক্ত ব্যবহার করিবার আগ্রহ আছে, তিনি যেন যথাযথ শিক্ষার পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি অভীক্ষা প্রয়োগ করতে না যান। প্রচলিত অভীক্ষাগুলি খেলার ছলে বা কৌতূহল-বশতঃ পরীক্ষা করাও এক হিসাবে অনিষ্টকর ; কারণ, পরে যদি কোনও উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই শিশুর উপর অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করতে চান, তখন সেগুলির কার্য্যকরিতা থাকবে না। এই সম্পর্কে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষামনোবিদ্যা পড়াবার রীতিমত ব্যবস্থা আছে, সেগুলির সহায়তা নেওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা। একমাত্র এইরূপ শিক্ষাতেই বিধিমত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির সাহায্যে শিশুর স্বকীয় শক্তির পরিমান নির্ভুলভাবে জানা যায় ; এবং শিক্ষকের কাছে তার মূল্য যে খুব বেশী, তা আগেই দেখা গেছে।

৩। কতকগুলি শিশুর বিবরণ

মানসিক অনুপাত কি এবং কি ভাবে তা নির্ণয় করা যায়, তার কতকটা ধারণা পাওয়া গেল। এখন বিভিন্ন মানসিক স্তরের সত্যিকারের কয়েকটি শিশুর কথা বলা যাচ্ছে, ও তাদের আচরণে কি প্রভেদ রয়েছে তাই তারপর দেখা যাবে।

যদু ছেলেটির বয়স সাত বছর দশ মাস। কিন্তু সে এখনও শিশু শ্রেণী থেকে প্রাথমিক বিভাগে উন্নীত হয় নি, কারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় সে দেড় বছর পিছিয়ে আছে। বর্ণনায় তাকে বলা হয় খুব বোকা ;

তাকে দেখতেও তাই, মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে, কোটরগত চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি, প্রাণহীন তার গতি। উৎসাহ দিয়ে কথা বললে তার মুখে সামান্য হাসির রেখা ফুটে উঠে, কিন্তু তার একটুও স্ফূর্তি বা চেষ্টা নেই, জগৎ সম্বন্ধে কোনও আগ্রহই নেই। তার অভীক্ষা গ্রহণ করা হ'ল। সে তেরটি মুদ্রা গণনা করতে এবং চারটি পরিচিত মুদ্রার নাম বলতেও পারল। ডান ও বাঁ দিকের প্রভেদ সে দেখাল। কয়েকটি মুখের ছবি তাকে দেখান গেল, তার কোনটির একটি চোখ নেই, কোনটির নাক বা মুখবিবর নেই, সেগুলির ত্রুটি সে ধরতে পারল। কতকগুলি সহজ ও কার্য্যকরী প্রশ্নের উত্তর সে দিলে ; তাকে কয়েকটি বাক্য শোনান হল, সেগুলি সে অবিকল বলতেও পারল। এই ভাবে সে ছয় বছর বয়সের অভীক্ষাগুলিতে সাফল্য দেখাল। কিন্তু পাঁচ বছরের দুটি অভীক্ষা সে পারল না। তাকে তিনটি অতি সহজ কাজ বলা হল, সেগুলি একবার শুনে পর পর সে করতে পারল না ; কাজগুলি হচ্ছে, টেবিলের উপরে চাবী রাখা, দরজা বন্ধ করা, তার পরে দরজার পাশে একটি টেবিল থেকে একখানি বই নিয়ে আসা। তাছাড়া কয়েকটি সাধারণ জিনিসের সংজ্ঞা পাঁচ বছরের শিশুরা সচরাচর যেমন দিয়ে থাকে, তা সে দিতে পারল না। কিন্তু আবার সাত বছরের দুটি অভীক্ষায় সে কৃতকার্য্য হল। কয়েকটি ছবিতে কি আছে, তার ঠিক বর্ণনা সে করল ; এবং রুইতন আকারের একটি চিত্রও সে দেখে দেখে আঁকতে পারল। কিন্তু এই বয়সের অন্য অভীক্ষাগুলি বা তার অধিক বয়সের কোনও অভীক্ষায় সে সফল হ'ল না ; যেমন, দুই হাতে কটি আঙুল আছে না গুণে বলা, কতকগুলি পরিচিত জিনিসের প্রভেদ বোঝান; এগুলি সে পারল না। তার মানসিক বয়স ধরা হ'ল ঠিক ছয় বছর, কারণ, নিয়ম অনুসারে সাত বছরের দুটি অভীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য পাঁচ বছরের দুটির বিফলতা

আর ধরা হল না ; আর তার বুদ্ধির অঙ্ক হ'ল ৭৭। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ছেলেটি জড়বুদ্ধিতার নির্দ্দিষ্ট সীমার খুবই কাছ ঘেঁসে আছে, সুতরাং পড়াশুনায় তার অতখানি পিছিয়ে থাকায় আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

যদু ছেলেটিকে দেখতেও বোকা, সে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আর একটি ছেলে আছে মাধব। তার শিক্ষকের বিবরণে দেখা গেল যে সেও পড়াশুনায় এক বছর পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু তাকে একটুও নির্ব্বোধ দেখায় না, আর সে যারই সামনে আসুক তার মুখে মধুর আনন্দের হাসিটি লেগেই রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে স্পষ্টভাবে নিজের নাম বলে দেয় ; বয়স বলে ছয় বৎসর, যদিও প্রকৃত বয়স ছয় বৎসর দশ মাস। যিনি প্রশ্ন করছিলেন তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানাল যে তাঁর সঙ্গে খেলা করবার তার ইচ্ছা আছে ; আর অন্য সব ছেলেদের হারিয়ে সে প্রথম হতে চায়। অভীক্ষাগুলির মধ্যে যেগুলি সে পারল, খুব স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের সঙ্গেই সেগুলি সে করল। কিন্তু তার ভুল সম্বন্ধে তাকে একটুও সজাগ দেখা গেল না, এবং অবশ্য অভীক্ষাকারীও ভুল গেলে কখনও তার কথা বলেন না। পাঁচ বছর বয়সের উপযুক্ত মাত্র চারটি অভীক্ষায় সে কৃতকার্য্য হল ; একই আকার অথচ ভিন্ন ওজনের দুটি জিনিসের মধ্যে কোনটি ভারী বলে দেওয়া, এবং খুব সাধারণ বস্তুর সংজ্ঞা দেওয়া, এই দুটি সে পারল না। শেষের অভীক্ষায় তার ভুল করার ধরনটিও লক্ষ্য করবার মত। অধিকাংশ পাঁচ বছরের ছেলেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "চেয়ার কাকে বলে?" তারা হয় ত বলবে চেয়ার বসবার জন্য বা আমরা চেয়ারে বসি এই রকম কিছু। কিন্তু মাধবকে এই প্রশ্ন করাতে সে হাসিমুখে শুধু একটি চেয়ার দেখিয়ে দিলে, কিন্তু কিছু বললে না। আবার যখন প্রশ্ন করা হল ঘোড়া

কাকে বলে সে দেয়ালে টাঙান এক ঘোড়ার ছবি দেখিয়ে দিলে। ছয়টি জিনিষের মধ্যে পাঁচটির বেলাতেই ঠিক একই রকম হল। প্রশ্নের ষষ্ঠ বস্তুটি পরিচিত হলেও চোখের সামনে ছিল না তাই সেবার সে বড় মুস্কিলে পড়ল, কিন্তু তার মুখের প্রফুল্ল হাসিটি ঠিক তেমনই রইল।

এখন আমাদের হয় ত প্রথমে মনে হতে পারে যে শিশুকে চেয়ার কাকে বলে? জিজ্ঞাসা করলে সে যদি শুধু চেয়ারটি দেখিয়ে দেয় সে ত বুদ্ধিরই লক্ষণ। তিন বছরের শিশুর বেলায় সে কথা সত্য বটে। কিন্তু পাঁচ বা তার বেশী বয়সের ছেলেকে এই প্রশ্ন করলে সে যদি ভাবে যে তাকে চেয়ার দেখিয়ে দিতে বলা হচ্ছে তা হ'লে স্পষ্টই বুঝতে হবে যে তার বুদ্ধির বিকাশ বয়সের উপযুক্ত হয় নি। তার চিন্তা কেবল তার সম্মুখে বর্তমান প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে ধারণার স্তরে পৌঁছায় নি। চেয়ার কি সে ধারণা তার হয় নি, শুধু স্থূল বস্তুটির নাম সে জেনে রেখেছে। তাই বস্তুটি সামনে না থাকলে আর তার বুদ্ধি যোগায় না, তার কথা সে কিছুই বোঝাতেও পারে না।

পূর্ব্বোক্ত যদু ছেলেটির মত, মাধব কিন্তু ছয় বছর বয়সের অভীক্ষার মধ্যে তেরটি মুদ্রা গণনা ডান ও বাঁদিক দেখান অতি সহজ সমস্যার সমাধান এগুলি পারল না; ছয় বছরের অভীক্ষগুলির মাত্র দুটিতে সে সফল হ'ল। সাত বছর বয়সের অভীক্ষার মধ্যে সে পারল তিনটি; তার হাতের আঙুলের সংখ্যা না গুনে সে বলতে পারল, রুইতনের আকার দেখে দেখে আঁকল আর পাঁচ অঙ্কের একটি সংখ্যা একবার শুনে ঠিক বলে গেল। কিন্তু মহা আনন্দে খুব চেষ্টা করেও এর বেশী কিছুই সে পারল না। তার মানসিক বয়স হল সাড়ে পাঁচ বছর, বুদ্ধাঙ্ক ৮৬। সুতরাং তার ভাল চেহারা ও প্রীতিকর ভাবভঙ্গী হলেও যদুর চেয়ে সে কম নির্ব্বোধ নয়।

শিশুর মানসিক শক্তির পরিচয় পাবার জন্য শুধু তার চেহারার উপর কতটুকু নির্ভর করা যায় উপরের ছেলে দুটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আগে বিশ্বাস করা হত যে মানুষ নির্ব্বোধ বা জড়বুদ্ধি হলে সে সঙ্গে তার শারীরিক নিদর্শনও সব ক্ষেত্রেই থাকে। কিন্তু এখন আমরা জানি যে সে কথা সত্য নয়, সুতরাং সোজাসুজি ভাবে বুদ্ধির মাপ নির্ণয় করাই নিরাপদ। এ বিষয়ে মনোবিদ সিরিল বার্ট বহু পূর্ব্বেই চূড়ান্তভাবে বলেছেন, মুখ ও মাথা দেখে মানসিক শক্তির বিচার যে বিশ্বাসযোগ্য নয় সে সম্পর্কে মনোবিদেরা এখন একমত। শিশুকে উপযুক্ত সমস্যা দিয়ে তার বয়স অনুপাতে সেগুলির সমাধান সে কি ভাবে করে তাই লক্ষ্য করাই হ'ল শিশুর স্বকীয় সামর্থ্য নির্দ্ধারণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা।

কিন্তু এখন আর একটি সাত বছরের শিশুর ব্যাপার দেখা যাক। গোপাল ছেলেটির বয়স প্রায় প্রথমোক্ত যদুর সমান, সাত বছর নয় মাস। সে বিদ্যালয়ে তার বয়সের উপযুক্ত শ্রেণীতে রয়েছে লেখাপড়াও ভাল করে। সে চুপচাপ কিন্তু প্রশ্নের উত্তর তার কাছ থেকে ঠিক উত্তর পাওয়া যায় এবং তার আচার ব্যবহারও প্রীতিপ্রদ। অভীক্ষাতে সে ধীরভাবে সমস্যাগুলির সমাধান করে যায়। প্রথম তার ভুল হয় আট বছর বয়সের অভীক্ষাসমূহের শেষটিতে তাতে কয়েকটি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয় সব কটি সে পারে নি। নয় বছরের অভীক্ষগুলিতে তার দুটি ভুল যায় কিন্তু আবার দশ বছরের অভীক্ষার একটি ছাড়া সবকটিতেই সে সফল হয় ; যেটি সে পারে নি, সেটিও শব্দের অর্থ বলার প্রশ্ন। তারপরে সে এগার বছরের দুটি এবং বার বছরেরও একটি অভীক্ষায় সাফল্য দেখায়। শেষেরটি হচ্ছে ডাকঘর নদীর দৃশ্য এই ধরনের কয়েকটি ছবির বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া আরও কম বয়সের অভীক্ষায় এই ছবিগুলি শুধু বর্ণনা করতে বলা হয়। এবং উত্তরটি সে ঠিকমত

ভালভাবে দিলে। তার সবগুলি সাফল্য হিসাব করে মানসিক বয়স দাঁড়াল দশ বছর এবং বুদ্ধির অঙ্ক ১২৯। এখন ভেবে দেখা যাক, যে শ্রেণীতে এই যদুর মত ছেলেরা আছে, আবার গোপালের মত বুদ্ধিমান ছেলেও কিছু আছে, সে শ্রেণীতে পড়ান কি কঠিন সমস্যা। শিক্ষক একসঙ্গে উভয়ের প্রয়োজন ঠিকভাবে মেটাবেন কি করে, এক রকম কাজ দিয়ে সমস্তক্ষণ আটকে রাখবেনই বা কিরূপে? যে মৌখিক পাঠ গোপালের মত ছেলের উপযুক্ত, সেটি যদুর ন্যায় বালকের বোধ এবং সামর্থ্যের বহু উর্দ্ধে থাকবে; আবার অঙ্কের কোনও সহজ প্রক্রিয়া যদুর মত করে বোঝাতে গেলে গোপালের মত মেধাবী ছেলেদের বিরক্তি ও চাঞ্চল্য আসবে।

অথচ এমন ব্যাপার একটুও বিরল নয় যে, বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীতে সাধারণতঃ যে সব ছেলে পড়ে, তাদের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য রয়েছে উপরের ছেলেগুলির মত, কিংবা তার চেয়েও বেশী। কোনও এক শ্রেণীর শিশু-গুলির অভীক্ষা থেকে সত্যই দেখা গেল যে, প্রথম ছয়টি শিশুর বুদ্ধির অঙ্ক যথাক্রমে ৭৪, ৮৭, ১০৪, ১২১, ১৪৩ এবং ৯৯; কি বিশাল বৈষম্য সূচিত হচ্ছে এই অঙ্কগুলির মধ্যে! যার বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪৩, সে একটি মেয়ে, চুপচাপ ও চেহারাটি বেশ; আর বলা বাহুল্য, তার মেধাও সাধারণের বহু উপরে। মানসিক মান ১৪০ এর বেশী খুবই বিরল, আর বুদ্ধির দিক থেকে তাদের উন্নতির সম্ভাবনাও সর্ব্বাধিক। এরকম শিশুদের ভবিষ্যতের দিকে নজর রাখতে হয়, অধ্যাপনা সার্থক করবার অপূর্ব্ব সুযোগও এদের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই শ্রেণীরই নীচের দিকের বুদ্ধ্যঙ্কগুলি দ্বারা যে অল্প ক্ষীণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাদের এবং এই মেয়েটির বুদ্ধিতে কি বিরাট প্রভেদ!

অন্য এক স্কুলে একটি বালিকাকে দেখা গেল, চোখদুটি উজ্জ্বল, বয়স

নয় বছর দুই মাস। শিক্ষয়িত্রী তাকেই শ্রেণীর সব চেয়ে বুদ্ধিমতী মেয়েদের অন্যতম বলে বেছে দিলেন ; সে পরে বৃত্তি পাবে, এমন সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। সে বেশ সহজভাবে ও আনন্দে কথাবার্ত্তা বললে, এবং অভীক্ষার মধ্যে যে সমস্ত কথার সূত্রপাত হ'ল, তার আলোচনা করল। তার বাড়ী, খেলাধূলা, বিদ্যালয়ে তার কি কি ভাল লাগে, এই সমস্ত গল্প সে করল। যখনই এমন কোনও প্রশ্ন আসছিল, যেটি সে পারে, তখনই তার মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠছিল ; আর যে প্রশ্ন তার সামর্থ্যের বাইরে, সেটির সমাধানের চেষ্টা করেও সে যে আনন্দ পাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছিল। তার বয়সের সব কটি অভীক্ষাতেই সে সহজে কৃতকার্য্য হল ; কেবল একটি ছাড়া দশ এবং এগার বৎসরের অভীক্ষাসমূহও সে পারল। তার পরে বার বছরের অভীক্ষা তিনটি, তের বছরের দুটি এবং চৌদ্দ বছরের একটিতেও সে সক্ষম হল ; শুধু তাই নয়, দুটি ষোল বছরের অভীক্ষা, যাকে বলা হয় সাধারণ পূর্ণবয়স্কের (average adult) অভীক্ষা, এবং একটি আঠার বছরের বা মেধাবী পূর্ণবয়স্কের (superior adult) অভীক্ষার সমাধানও সে করল। ষোল বছরের একটি অভীক্ষায় এক সাঙ্কেতিক সূত্র রয়েছে, সেটি ধরবার সময়ে মেয়েটি বললে যে, বাড়ীতে খেলবার জন্ম সে ও তার বোন এক 'সাঙ্কেতিক ভাষা' রচনা করেছিল ! আর শব্দতালিকার এক অভীক্ষায়, 'বক্তৃতা' শব্দটির অর্থ বলবার সময়ে সে বললে, "এ আমি জানি, কারণ আমার বাবা বক্তৃতা শুনতে যান ; একবার আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গিছলেন।" এই থেকে তার বাড়ীর জীবনযাত্রাতেও খানিকটা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে নানা বিষয়ে আগ্রহ আছে ও কথাবার্ত্তা হয়। মেয়েটির পিতা পালিশের কাজ করেন, তাঁর কর্ম্ম সম্বন্ধেও সে কিছু বলতে পারল।

কিন্তু শিশু সপ্রতিভরূপে কথাবার্ত্তা বললেই যে সর্ব্বক্ষেত্রে তা বুদ্ধির

পরিচায়ক, এমন নয়; এটিও ঠিক শিশুর চেহারার আকর্ষণেরই মত। বরং বেশী কথাবার্তায় কখনও কখনও শিশুর নির্বুদ্ধিতাই ঢাকা পড়ে থাকে, এমন কি তা শিক্ষকের চোখেরও আড়ালে থেকে যায়। এই বিদ্যালয়ের আর একটি মেয়ের বিবরণ থেকেই তার উদাহরণ পাওয়া যায়। এই মেয়েটির বয়স আট বছর তিন মাস, এবং সাধারণ মেয়ের চেয়ে অধিক বুদ্ধি আছে মনে ক'রে তার শিক্ষয়িত্রী তাকে বেছে নিয়েছেন। সে খুব কথা বলে, প্রথম থেকেই অভীক্ষাকারীর সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেল। অভীক্ষার মধ্যে শব্দতালিকার একটি শব্দ নিয়ে এক ধাঁধা পর্য্যন্ত সে বলে দিলে, চুপি চুপি গোপনে বড় মজার ভঙ্গীতে শব্দটির যে দুটি মানে হয়, তাও সে জানাল। কিন্তু তবু দেখা গেল বেচারী বড়ই নির্বোধ, তার বুদ্ধির অঙ্ক মাত্র ৭৭। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরই সে দিলে একেবারে বেপরোয়া আন্দাজের উপর; নিজের ধারণাটি পরীক্ষা করে দেখা বা কোনও কথা ধৈর্য্য সহকারে বোঝবার চেষ্টা করার কিছুমাত্র আগ্রহ তার দেখা গেল না। তার সপ্রতিভ কথাবার্তা এবং চটপটে ভাব দেখে তার শিক্ষয়িত্রী পর্য্যন্ত ভ্রান্ত হয়েছেন; অবশ্য তিনি সে শ্রেণীতে অল্পকালই পড়াচ্ছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের উপরকার শ্রেণীর লেখাপড়ায় এগুলি থেকে সে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না।

সব শেষে তৃতীয় আর একটি মেয়ের কথা বলা যাচ্ছে। তার বয়স এগার বছর তিন মাস, কিন্তু দেখতে বড়, দেহের বাড় বেশী, দেখলে প্রায় পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোক মনে হয়। আকৃতি তার সুগঠিত, কিন্তু ভাবটি ভারী ভারী ও অসাড়। অভীক্ষায় সে সাত বছরের একটি ও আট বছরের দুটি প্রশ্ন ভুল করল, তার উপরে সে কেবল নয় বছরের দুটি এবং দশ বছরের একটিমাত্র অভীক্ষা পারল। তার মানসিক বয়স দাঁড়াল ঠিক আট বছর, এবং বুদ্ধির অঙ্ক মাত্র ৭১। বিদ্যালয়ে সে উপরে বর্ণিত

মেধাবী বালিকাটির সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু পড়াশুনায় তার চেয়ে এবং অন্য সব মেধাবী শিশুদের চেয়ে সে অনেক পিছিয়ে থাকে। আর শ্রেণীতে যখন একসঙ্গে পড়ানো হয়, তখন অন্যদের এবং তার উত্তরে কতখানি প্রভেদ থাকে, তা সহজেই বুঝা যায়।

৪। বুদ্ধির মান ও তার ব্যবহারিক মূল্য

উপরে বিভিন্ন মানসিক মানের কয়েকটি সত্যিকারের ছেলেমেয়ের আচরণ পৃথকভাবে দেখা গেল। এখন আবার সাধারণ আলোচনার সূত্র ধরা যাক।

একটি কথা আগেই বলা হয়েছে যে, শিশুর বুদ্ধির অঙ্ক বা মানসিক মানটি যদি নিভূ'লভাবে বার করা যায়, তবে সেটি অনেকটা স্থির এবং স্থায়ী জিনিষ বলেই ধরা চলে। কতকগুলি শিশুকে নিয়মিতভাবে কিছুকাল অন্তর দীর্ঘ একটা সময় ধরে কোনও কোনও মনোবিৎ দেখেছেন ; ছয় বছর ধরে অভীক্ষা করে দেখে, প্রতিবার এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে যে, শিশুর বড় হওয়ার সমগ্র সময়টিই মোটামুটিভাবে তার মানসিক মান দ্বারা সূচিত বুদ্ধির পরিমাণ আশ্চর্য্য রকম সমান থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন অবশ্য হয়, কখনও ভাল কখনও বা মন্দের দিকে, কিন্তু তার পরিমাণ অতি সামান্য, তা ছাড়া এটুকু পরিবর্ত্তন ও ব্যতিক্রমও খুব অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই ঘটে। এই সমস্ত পরীক্ষায় যে সকল তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে সাধারণভাবে এই বিশ্বাসই আমাদের হয় যে, আরম্ভে যে শিশু একটু নির্ব্বোধ থাকে, সারা জীবনই তার বুদ্ধির অভাব থেকে যায় ; আবার যে ছেলে বুদ্ধিতে প্রথমে সাধারণের চেয়ে উচুঁতে থাকে, তার সেই স্থান থেকে নেমে যাবার সম্ভাবনা নেই। কোনও একটি শিশুর বুদ্ধি বিভিন্ন বয়সে হয় ত

একটু কম বা একটু বেশী মনে হতে পারে, কিন্তু সে গোড়াতে বুদ্ধির যে পর্য্যায়ে ছিল, জড়বুদ্ধি, নির্ব্বোধ, সাধারণ বা মেধাবী, তা থেকে তার উন্নতি বা অবনতি, কোনটিই ঘটতে পারে না।

স্বনামধন্য মনোবিৎ বার্ট এক পরীক্ষায় চৌত্রিশটি জড়বুদ্ধি শিশুকে বছরে একবার ক'রে ছয় বছর ধ'রে অভীক্ষা করে দেখেছিলেন। তার ফলে পর পর বছর সকলের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় পাওয়া গেল, ৬৩·৭, ৬৫·৩, ৬৪·৫, ৫৯·৮ এবং ৫৭·১। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "আটজন ছাড়া বাকী সব কটির বেলাতেই দেখা গেল যে শেষ বছরের মানসিক মান, পাঁচ বছর পূর্ব্বে যা মান ছিল তার চেয়ে কম।"

এই সব থেকেই একটি কথা বুঝা যায় যে, ছেলেমেয়েদের শিশু-বিভাগের পাঠ শেষ হবার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ সাত বছর বয়সের আগে, তাদের মানসিক অনুপাতটি বার করে দেখে নেওয়া বিশেষ আবশ্যক। যে কোনও বয়সে সে কতটা জ্ঞান অর্জ্জন করবে, তা তার গৃহ ও বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা এবং সেই সঙ্গে তার স্বকীয় গুণাবলীর উপরে নির্ভর করবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট মানের অভীক্ষাতে তার বুদ্ধির পরিমাণ যা নিরূপিত হবে, তার মধ্যে অদৃষ্ট, সুযোগ আর ভাল বা মন্দ পদ্ধতির শিক্ষার ইতর বিশেষে কোনই তারতম্য ঘটবে না। মানুষের নিজস্ব গুণ বা বুদ্ধি তার বংশগত সহজাত জিনিষ। সুতরাং এমন বললেও ভুল হয় না যে, যদি মানুষ যথার্থই বুদ্ধিমান হতে চায়, তবে তার শিক্ষক নির্ব্বাচনের চেয়ে মাতাপিতা নির্ব্বাচনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

আবার কুশলী মনোবিৎ শিশুর যে মানসিক মান নির্ণয় করেন, দেখা যায় যে তা, শিশু সম্বন্ধে তার শিক্ষক যে সাধারণ ধারণা পোষণ করেন, তার চেয়ে, এমন কি বিদ্যালয়ে শিশুর ফলাফল অপেক্ষাও অধিক নির্ভরযোগ্য। মোটের উপর শিশু বিদ্যালয়ে কেমন লেখাপড়া করছে তাই

থেকে তার সামর্থ্যের ঠিক পরিচয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময়ে শিক্ষকেরও ভুল হতে পারে, যেমন সেই মেয়েটির বেলায়, যার সপ্রতিভ কথা ও চটপটে ভঙ্গীর আড়ালে অনেকখানি বোকামী ঢাকা ছিল ; তার কথা উপরে বলা হয়েছে। আবার কোনও ধীর, চিন্তাশীল অথচ নির্ভরযোগ্য শিশু, যে দলের মধ্যে নিজের বুদ্ধির পরিচয় কখনও দিতে পারে না, তার সম্পর্কেও এমন ভ্রান্তি ঘটতে পারে। কখনও হয় ত শিশুর ব্যক্তিত্ব বা স্বাভাবিক ভাবটিই শিক্ষকের ভাল লাগে না, কিংবা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরস্পর বনে না ; তেমন স্থলেও শিশুর গুণাগুণ সম্বন্ধে শিক্ষকের নিকৃষ্ট ধারণা হয়। আবার যে শিশু মেধাবী কিন্তু অভিমানী, তার পড়া একজন শিক্ষকের কাছে হয় ত খারাপ হবে, কিন্তু অন্যের কাছে ভাল হবে। সে রকম ছেলে হয় ত শ্রেণীর সমপাঠীদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে না পারার জন্ম অথবা বাড়ীর অপ্রীতিকর অবস্থার জন্য পড়াশুনায় পিছিয়ে যেতে পারে। অসুখের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার বিদ্যালয়ের ফলাফলের সহজেই অবনতি ঘটবে, কিন্তু তার অভীক্ষার ফলের বেলায় তেমন হবে না। তা ছাড়া শিশু যদি এমন শ্রেণীতে থাকে যেটি তার জ্ঞানবুদ্ধির উপযুক্ত নয়, তা হ'লেও তার বিদ্যালয়ের ফল মন্দ হয়। শ্রেণীর মান যদি তার পক্ষে খুব সহজ হয়, তবে বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যের ফলে তার পড়া খারাপ হয়, আবার কঠিন হ'লে শিশু আসলে যতটা নির্ব্বোধ, তাকে তার চেয়েও বেশী নির্ব্বোধ মনে হয়।

এই যে কথাগুলি বলা গেল, এ রকম ব্যাপার অস্বাভাবিক বা বিরল নয়। এরূপ ঘটনা সর্ব্বত্র সব সময়ে ঘটছে, অভিজ্ঞ ও তীক্ষ্নদৃষ্টি শিক্ষকমাত্রেরই কাছে এগুলি সুপরিচিত। এই সব ক্ষেত্রে যদি কোনও অভিজ্ঞ অভীক্ষাকারী শিশুকে যথাবিহিত অভীক্ষা করে দেখেন, তা থেকে তার সামর্থ্যের আসল পরিমাণটি বুঝা যায়, এবং লেখাপড়ার

বন্দোবস্তের কি পরিবর্তন করতে হবে, তাও ঠিক করা যায়। এমন বহুসংখ্যক ঘটনা অনুসন্ধান ক'রে দেখা হয়েছে, যেখানে শিশুর বিদ্যালয়ের ফলাফল বা শিশু সম্বন্ধে বড়দের সাধারণ অভিমত থেকে তার অভীক্ষার ফলে বৈষম্য পাওয়া গেছে, এবং তার অভীক্ষা অনুযায়ী পড়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সুফল লাভ হয়েছে।

সুতরাং সব দিক থেকেই দেখা যায় যে, অন্ততঃ শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া আরম্ভ করার সময়টিতে তাদের অভীক্ষা করে দেখা পরম বাঞ্ছনীয়। উপরে বর্ণিত যে কোনও কারণে শিশুর লেখাপড়ার উন্নতি যদি ঠিকমত না হয়ে থাকে, তবে এই অভীক্ষার ফল থেকেই তার যথোচিত প্রতিকার হতে পারে।

শুধু তাই নয়; এখন আমরা এই কথাও বুঝতে পারছি যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শ্রেণীবিভাগ তাদের মানসিক অনুপাত দ্বারা সূচিত স্বকীয় শক্তির ভিত্তিতেই হওয়া সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত। উন্নতিশীল ও সুশিক্ষিত দেশসমূহের শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণ এই মত সমর্থন করেন, এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানসিক অভীক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা করার সুযোগ দিচ্ছেন।

যে সব ছেলেমেয়ের সহজাত শক্তি মোটামুটি সাধারণ পর্য্যায়ের, তাদের যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ হ'লে এক রকম চলে যায়। যদি কোনও বিদ্যালয়ের মাঝামাঝি বুদ্ধির সব কটি ছাত্র বেছে নেওয়া যায়, যেমন যাদের বুদ্ধির অঙ্ক ৯৫ থেকে ১১০এর মধ্যে, তা হলে সচরাচর দেখা যাবে যে, সেই ছেলেগুলি অন্ততঃ তাদের বয়সের অনুযায়ী শ্রেণীতেই ঠিকভাবে পড়াশুনা করছে, তার চেয়ে বেশী উঁচু শ্রেণীতে নয় বা খুব নীচেও নয়। সুতরাং আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী ও বিদ্যালয়ব্যবস্থা এই অধিকসংখ্যক সাধারণবুদ্ধির শিশুদের পক্ষেই যথেষ্ট অনুকূল।

কিন্তু যারা বেশী মেধাবী এবং যারা বেশী নির্ব্বোধ, এই উভয়বিধ শিশুই বর্ত্তমান ব্যবস্থাতে অসুবিধায় পড়ে। বুদ্ধিমান ছেলেদের পক্ষে বিদ্যালয়ের সাধারণ পড়া অত্যন্ত সহজ, তাই তাদের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়; আর অল্পবুদ্ধি ছাত্রদের এই পাঠই বড় কঠিন লাগে। বেশীর ভাগ মেধাবী ছাত্রদের ক্ষতিই বেশী হয়। নির্ব্বোধ ও পশ্চাৎপর ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ের ফল মন্দ হয় ব'লে তাদের দিকে সাধারণতঃ আপনা হতেই সকলের দৃষ্টি পড়ে। তাই মা বাপ ও শিক্ষকেরা তাদের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়ারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। কিন্তু যে ছেলের মনীষা সাধারণের উর্দ্ধে তার অবস্থা অন্যরূপ। তাকে পড়াশুনা করতে হয় সাধারণ স্তরের শ্রেণীতে, সেখানে কাজের মান তার শক্তির অনেক নীচে। সুতরাং এর স্বাভাবিক ফল এই হয় যে, তার শিক্ষা তার সহজাত বুদ্ধি অনুসারে যতখানি অগ্রসর হতে পারত, ততটা হয় না; অথচ লেখাপড়া শ্রেণীর তুলনায় ভালই হয় ব'লে, তারও যে বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন আছে, সে কথা কারও মনে হয় না! সুতরাং মেধাবী ছেলেরা বর্ত্তমান শ্রেণীগত পাঠনায় ক্রমশঃ নিম্ন সাধারণ পর্য্যায়ে নেমে আসতে থাকে। অবশ্য দুচারটি বুদ্ধিমান ছাত্র শ্রেণীর পড়ার দিকে না তাকিয়ে, এগিয়ে চলে, এবং তারা শ্রেণীকে বহুদূর ছাড়িয়ে যায়; কিন্তু মোটের উপরে অধিকাংশ প্রখরবুদ্ধি ছাত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এই বিষয়ে অভীক্ষা-সমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডাঃ ব্যালার্ড (Dr. Ballard) বলেছেন, "এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয় ব্যবস্থায় নির্ব্বোধ ছাত্রগুলির উপরই নজর পড়ে, প্রতিভাশালী ছাত্রদের উপরে পড়ে না। মেধাবী ছাত্রের বুদ্ধি সহজেই চাপা পড়ে থাকে, কিন্তু বোকা ছেলের পক্ষে তার নির্ব্বুদ্ধিতা গোপন করে

রাখা কঠিন।"[1] এটি এক অতি গুরুতর সমস্যা, বিশেষ মনোযোগ ও বিবেচনা সহকারে এর কথা আমাদের ভাবা দরকার।

এখনকার শিক্ষাসংস্কারকেরা এই সমস্যার বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। তাই তাঁরা এর সমাধানের চেষ্টায় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পৃথক পাঠের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করছেন। ডল্টন প্রণালী (Dalton Plan) প্রভৃতি নূতন সব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের সামর্থ্য ও রুচিগত পার্থক্যের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে, এবং সেইজন্য প্রত্যেক ছাত্র যাতে নিজের নিজের ধরণে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করতে পারে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এইরূপ পৃথক শিক্ষার বিশেষ মূল্য আছে। এ বিষয়ে আরও দীর্ঘতর আলোচনা শীঘ্রই করা যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবার কোনও বিদ্যালয়ই কিছু সমবেত শিক্ষা ও কর্ম্মব্যবস্থা ছাড়া চলতে পারে না, এবং তেমন চালান বাঞ্ছনীয়ও নয়। ডল্টন পদ্ধতির প্রবর্ত্তকেরা পর্য্যন্ত, গতানুগতিক শ্রেণীপাঠনা উঠিয়ে দিলেও, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমবেত অধ্যাপনা রেখে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীগত অধ্যাপনা ও যৌথ ক্রিয়াকলাপের অতি বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ এগুলির সাহায্যেই পৃথক পাঠ ও ব্যক্তিগত উন্নতির উপযুক্ত ভিত্তি ও পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তবে শিশুদের শ্রেণীর মধ্যে আনতে গেলেই, কোন পদ্ধতিতে শ্রেণী গঠিত হবে, সে কথা ভাবতে হবে।

শিশুদের শ্রেণীগঠন অবশ্য কেবল একটি মাত্র ভিত্তিতে যে হতে পারে না, তা সহজেই বুঝা যায়। ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করার

---

1 *Group Tests of Intelligence*

সময়ে, ছাত্রের বয়স বা অর্জ্জিত বিদ্যা, যে ভিত্তিতেই বিভাগ হোক না কেন, সে নিয়মের ব্যতিক্রম করতেও শিক্ষকেরা প্রস্তুত থাকেন। প্রায়ই কোনও না কোনও ছেলের জন্য নিয়ম পরিবর্ত্তন বা বর্জ্জন করারও প্রয়োজন হয়। তবে সব দিক বিবেচনা করলে মনে হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীবিভাগটি শিশুদের মানসিক মান অনুসারে হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়।

এই পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগের কার্য্যকরী ও বিস্তারিত পন্থা স্থির করে নিতে হবে, এবং তা বিদ্যালয়ের আয়তন ও সাধারণ অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন রকমের হবে। এক্ষেত্রেও ব্যালার্ডের উপদেশ সাধারণভাবে অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বলেছেন, "সমগ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্রমোন্নতির (promotion) ব্যবস্থায় কয়েকটি পৃথক ধারা বা ভাগ হওয়া উচিত ; তিনটি হলেই সুবিধা হয়। কোন ছাত্র কোন ভাগে থাকবে, তা স্থির করতে হবে তার মানসিক অনুপাত বা বুদ্ধ্যঙ্ক থেকে, অন্য কিছু থেকে নয়। তার কারণ, আর কিছু থেকে ত ছাত্রের বিষয় এতখানি জানা যায় না, আর ছাত্রগুলি সম্বন্ধে এই জ্ঞান না থাকলে বিদ্যালয়ে তাদের লেখাপড়ার উন্নতিও একটিমাত্র গতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। আর এরকম একই গতিতে সকলের লেখাপড়া এগোলে, বেশী বয়সের বোকা ছেলে এবং অল্পবয়সী মেধাবী ছেলের যে সমস্যা রয়েছে, তার নিষ্পত্তি করা অসম্ভব হবে। অবশ্য বিদ্যালয়ের অগ্রগতির মধ্যে তিন ভাগ থাকবে, এই কথা বলা হয়েছে বলে কেউ যেন না মনে করেন প্রতিটি শ্রেণীর স্থলে তিনটি করে শ্রেণী হবে। সচরাচর এই তিন ভাগের মাঝেরটির সঙ্গে প্রচলিত শ্রেণীগুলির সাধারণ মানের সামঞ্জস্য থাকে, খুব দ্রুত বা মন্থরগামী, এই দুই ভাগের সঙ্গে থাকে না। আর খুব বড় বিদ্যালয় না হলে এরকম পৃথক তিনটি করে অংশ সম্পূর্ণ

ভরে ফেলবার মত যথেষ্টসংখ্যক ছাত্রও পাওয়া যায় না। তাই সাধারণ আকারের বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা হতে পারে যে, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই তিনটি করে বিভাগ থাকবে, দ্রুত বা প্রখরবুদ্ধি, মাঝামাঝি এবং মন্থর বা অল্পবুদ্ধি, এবং প্রত্যেক বিভাগের পৃথক পাঠসূচী হবে। সাধারণতঃ এক শ্রেণীর এক বিভাগ থেকে পরবর্ত্তী উচ্চ শ্রেণীর সেই বিভাগটিতেই ছাত্রেরা উন্নীত হবে।"[1]

ছোটদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই এক অতি সার্থক এবং অসামান্য চিত্তাকর্ষক পরীক্ষার ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। শিক্ষার যে সকল নূতন প্রচেষ্টা এখনকার বিদ্যালয়গুলির মধ্যে নূতন প্রাণ ও উৎসাহ এনে দিয়েছে, তার কোনটির চেয়ে এর মূল্য এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কম নয়।

আমরা আশা করব যে, ভারতেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের সামর্থ্যনির্ণয় ও শ্রেণীবিভাগ করবার ভিত্তিরূপে মানসিক অভীক্ষার সার্ব্বজনীন প্রয়োগ ক্রমশঃ হবে। এই ক্ষেত্রে অভীক্ষার ব্যবহার এখনও পর্য্যন্ত কিছুই হয় নি বলা যায়। তা হ'লেও, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গেছে যে, আমাদের দেশের শিশুর উপযোগী অভীক্ষা রচনার ব্যাপারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কিছু প্রশংসনীয় কাজ করেছে, এবং বড়ই আশার কথা যে এই কাজ বর্ত্তমানে বর্দ্ধিত গতিতে চলছে। দেশের শিক্ষার পরিচালকেরা ক্রমেই উপলব্ধি করছেন বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষায় অভীক্ষাগুলির বহুল প্রয়োগ হওয়া আবশ্যক। গত কয় বৎসরের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বিষয়গত (objective) অভীক্ষা প্রশ্নকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ প্রচেষ্টা এখনও প্রাথমিক এবং পরীক্ষামূলক হলেও, এ

[1] *Group Tests of Intelligence.*

বিষয়ে লোকের আগ্রহের সুস্পষ্ট সূচনা দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন জোর দিয়ে এই কথা বলেছেন যে, নানা ধরণের অভীক্ষার ব্যাপক ব্যবহার এদেশে হওয়া উচিত এবং গতানুগতিক পরীক্ষার অনেকখানি কাজ এগুলির দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। তাঁরা এই বিধান দিয়েছেন যে "কেন্দ্রীয় শিক্ষাসংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে শিক্ষামূলক অভীক্ষা ও মাননির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুশীলনের ভার নিতে হবে, যাতে এই অনুশীলনলব্ধ ফল ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যায়।"[1] অবশ্য এই কমিশনের অভিমত স্বভাবতঃই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু এই কথাগুলি সাধারণভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক শিশুদের সম্পর্কেও সমরূপ প্রয়োগ করা যায়। এই ভরসা আমরা সকলেই করব যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমাদের যে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ও বর্দ্ধিত সুযোগ এনে দিয়েছে, তারই সাহায্যে আমরা দেশের ক্ষুদ্র শিশুগুলির বিদ্যাচর্চ্চায় বর্ত্তমান শতাব্দীর শিক্ষা-পদ্ধতির এই অসামান্য আবিষ্কারের যেন পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি।

মানসিক অভীক্ষার স্বরূপ ও ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা শুধু এ বিষয়ে পাঠকের আগ্রহের সঞ্চার করতে এবং বিদ্যালয়ে অভীক্ষা থেকে কতদূর সহায়তা পাওয়া যেতে পারে, সেইটুকু মাত্র দেখাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরে অবশ্য অভীক্ষা ব্যবহার প্রণালীর বিবরণ দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই প্রণালী যে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এর জন্য বিশেষ শিক্ষার যে অপরিহার্য্য প্রয়োজন, সে কথা বলা হয়েছে।

[1] *Report of the University Education Commission. p. 337.*

অভীক্ষা যে কেউ যথেচ্ছ প্রয়োগ ক'রে নির্ভুল ফল পাবেন বা সাধারণ গজ ফুটের মাপকাঠির মত যন্ত্রবৎ এগুলি ব্যবহার করতে পারা যাবে, এমন ভাবা মোটেই উচিত নয়। যাঁর এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আছে, যিনি কোথায় ভুল হতে পারে, এবং সে ভুল এড়াবার পন্থাই বা কি, এ সব কথা ভালভাবে জানেন, একমাত্র তাঁর হাতেই অভীক্ষার যথার্থ মূল্য পাওয়া যায়। এরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবার সুযোগ অদূর ভবিষ্যতেই বেড়ে যাবে, সে আশা যথেষ্ট রয়েছে।

৫। পৃথক কাজ

বিদ্যালয়ে পৃথক কাজের যে প্রচেষ্টা আজকাল চলেছে, তার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার সমর্থনে মনোবিদ্যায় কি তথ্য পাওয়া যায়, সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা যাক।

পূর্ব্বে দেখা গেছে যে এক শিশু এবং অন্য শিশুর মধ্যে প্রধান পার্থক্য তাদের সাধারণ শক্তির মানের সম্পর্কেই দেখা যায়। কিন্তু বিনের বুদ্ধির মানদণ্ড অনুযায়ী অভীক্ষা দ্বারা শিশুদের মানসিক অনুপাত নিরূপণ করার পরেও এমন অনেক প্রভেদ তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যেগুলি তাদের মানসিক মান দ্বারা সূচিত করা যায় না। এর কতকগুলি আবার বিদ্যালয়ের শিক্ষায় হাতে কলমে কাজে লাগে, শিক্ষকও এগুলি থেকে সহায়তা পেয়ে থাকেন।

প্রথমে দুটি শিশুর উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে, তাদের বয়স খুব কাছাকাছি, বুদ্ধির অঙ্কও প্রায় সমতুল্য। মায়া মেয়েটির বয়স আট বছর চার মাস, আর বুদ্ধ্যঙ্ক ১১৬। প্রীতির বয়স হ'ল আট বছর চার মাস, এবং বুদ্ধির অঙ্ক ১১৮। কিন্তু তাদের বুদ্ধির মানের এই সমতার আড়ালে

একটা বড় মজার প্রভেদ দেখা যায়। মায়ার বুদ্ধ্যঙ্ক যে ১১৬, এটি সে মানসিক মানদণ্ডটির মধ্যে খুব কাছাকাছি বা একটা সঙ্কীর্ণ বয়ঃসীমার অন্তর্গত অভীক্ষাগুলিতে সাফল্যের ফলে পেয়েছে। নয় বছর বয়সের সবগুলি অভীক্ষা সে পেরেছে, তার পরে দশ বছরের দুটি এবং এগার বছরের তিনটি অভীক্ষায় সে কৃতকার্য্য হয়েছে, এইখানেই তার সাফল্যের শেষ সীমা এসে গেছে। কিন্তু প্রীতির ১১৮ পাওয়ার মূলে দেখা যায় যে তার সাফল্য আরও অনেক বিস্তীর্ণ বয়সের সীমার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রথমে সে ছয় বছর বয়সের সব কটি অভীক্ষায় কৃতকার্য্য হল, তারপর বার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বছরের কয়েকটি ক'রে অভীক্ষা সে পারল, কয়েকটি পারল না। বার বছরের একটি অভীক্ষায় সে সফল হল, তার উপরে আর একটিও পারল না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে শেষ যে বয়সের অভীক্ষায় সে পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ ছয় বছর, তারপর আরও ছয় বছর ধরে তার সাফল্যের সীমা পরিব্যাপ্ত আছে। এদিকে মায়ার ব্যাপ্তির কাল মাত্র দুই বছর, দশ ও এগার। এক্ষেত্রে স্পষ্টই বুঝা যায় মেয়ে দুটির মন ঠিকভাবে জানতে গেলে, শুধু তাদের অভীক্ষায় সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব ক'রে তাদের মানসিক মানের সমতাটুকু জানলেই চলবে না, অভীক্ষায় তাদের ব্যাপ্তিকালের বৈষম্যের কথাও বিবেচনা করতে হবে।

আরও দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ললিতা নামে একটি মেয়ে, তার বয়স সাত বছর এগার মাস, মানসিক মান ১০৩। সাত বছর বয়সের সমস্ত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, তার সাফল্য পরবর্ত্তী তিন বছরের অভীক্ষা অবধি ব্যাপ্ত হয়ে রইল। আর একটি মেয়ে করুণার মানসিক মান ১০৪, কিন্তু প্রথম যে বয়সের অভীক্ষায় সে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয় নি সেই বয়স থেকে আরও পাঁচ বছর পর্য্যন্ত তার সাফল্য

ছড়িয়ে রয়েছে। আবার সতীশ ছেলেটির ব্যাপার আরও মজার। তার জন্মগত এবং মানসিক বয়স দুই সমান, আট বছর চার মাস, সুতরাং তার বুদ্ধ্যঙ্ক ঠিক ১০০। কিন্তু দেখা যায় যে, যত বয়সের অভীক্ষা সবগুলিতে সে কৃতকার্য্য হয়েছে, তার উপরে পর পর সাতটি বছর ধরে তার সাফল্য পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এতখানি বিস্তৃত ব্যাপ্তি কমই দেখা যায়। খানিকটা ব্যাপ্তি, যেমন দুই থেকে চার বছর, খুব সাধারণ ব্যাপার। এরকম প্রায়ই দেখা যায় যে ছেলেটি তার নিজের বয়সের ও তার পূর্ব্ববর্ত্তী বছরের দু একটি অভীক্ষায় ভুল করল, কিন্তু পরের দু বছরের অভীক্ষায় সাফল্যের দ্বারা তার পূরণ হয়ে গেল। এরূপ ঘটবার কারণ এই যে এখানে যাকে বুদ্ধি বলা যাচ্ছে, তা বহু এবং বিবিধরূপে প্রকাশ পায়, আর বিনের মানদণ্ডের মধ্যেও নানা বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োগ রয়েছে। কিন্তু অভীক্ষাসাফল্যে ছয় বা সাত বৎসরের ব্যাপ্তি সাধারণতঃ দেখা যায় না।

এরূপ হওয়ার অর্থ কি, সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠবে। উত্তরে বলা যায় যে এর কারণ দুটির মধ্যে যে কোনও একটি বা উভয়ই হতে পারে। প্রথমতঃ, মানসিক কোনও বিশেষ গুণ, যেমন সংখ্যা বিষয়ক স্মৃতি, আকারগত দর্শনস্মৃতি (visual memory) অর্থাৎ একটি বিশেষ আকার চোখে দেখে সেটি মনে ক'রে রাখবার ক্ষমতা, কথাবার্ত্তায় পটুতা, ইত্যাদির আধিক্য বা স্বল্পতার আংশিক প্রভাব ; দ্বিতীয়তঃ, স্বভাবগত অস্থিরচিত্ততা। কোন ছেলের বেলায় এই দুইটির কোন কারণটি বর্ত্তমান রয়েছে, তা অভীক্ষার সময়ে ছেলেটির হাবভাব আচরণ থেকে কতকটা বুঝা যায়, এবং কোন অভীক্ষাগুলি সে পেয়েছে এবং কোনগুলি ভুল করেছে, তা দেখেও খানিকটা বুঝতে পারা যায়।

প্রথমে স্বভাবগত সমস্যাটির কথা বলা যাচ্ছে। হয়ত দেখা গেল যে শিশু কোনও বয়সের একটি অভীক্ষায় কৃতকার্য্য হ'ল, অথচ তার আগের বছরের ঠিক সেই শ্রেণীর অভীক্ষাই সে পারে নি—যেমন কয়েকটি সংখ্যা শুনে বিপরীত দিক থেকে বলা, কতকগুলি শব্দাংশ শুনে বলা, অথবা সহজ, ব্যবহারিক সমস্যা বুঝতে পারা, যে সব ধরণের অভীক্ষা একাধিক বয়সের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে কম বয়সের অভীক্ষায় অসমর্থ হওয়ার কারণ তার বুদ্ধির ত্রুটি নয়, তার প্রক্ষোভ বা অনুভূতি ঘটিত কোনও বাধ (inhibition) অর্থাৎ অজ্ঞাত দ্বিধাই এর মূল।

আবার শিশুর অভীক্ষা যখন চলতে থাকে, সেই সময়ে সে যাতে অসঙ্কোচ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে, তার জন্য অভীক্ষক সবিশেষ যত্ন নেন। সুতরাং এই কথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে যে অভিজ্ঞ ব্যবহারিক মনোবিদের অভীক্ষায় যে শিশুর ফলাফলে সামঞ্জস্য ও স্থিরতার এরকম অভাব দেখা যায়, তার বাস্তব জীবনের আচরণে সেই দুর্ব্বলতা আরও বেশী ক'রে দেখা যাবে। এই সব শিশু প্রায়ই দুর্ব্বলস্নায়ু ও অভিমানী হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা তাদের অনুভূতি সহজে প্রভাবিত হয়। এই শ্রেণীর শিশু যদি বিশেষ মেধাসম্পন্ন হয়, তবে অনুকূল অবস্থায়ও তাদের ফল অতি উৎকৃষ্ট হতে পারে; কিন্তু বিদ্যালয়ের পড়ায় এবং পরীক্ষায় তারা সর্ব্বদা তাদের এই সুনাম বজায় রাখতে পারবে, সে বিষয়ে তাদের উপরে নির্ভর করা চলে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, তারা এক শিক্ষকের কাছে বেশ ভাল লেখাপড়া করছে, কিন্তু অন্য যে শিক্ষকের বোধ ও সহানুভূতি কম, তাঁর নিকটে তাদের শিক্ষা ভাল হচ্ছে না। এই ধরণের শিশুর পক্ষেই দক্ষ মনোবিদের সাহায্য প্রয়োজন, যাতে তার

মানসিক অনুপাত প্রকৃতরূপে নিরূপিত হয়ে তার আসল শক্তি বোঝা যায়।

কিন্তু যে শিশুর অভীক্ষাফলের ব্যাপ্তি উপরের উদাহরণগুলির মত অনেক বছর বিস্তৃত থাকে, অভীক্ষাকালের আচরণ দেখে শুধু যে তেমন শিশুরই স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নয় ; অভীক্ষা চলার সময়েও সকল শিশুরই স্বভাবটি প্রকাশ পায়। ছেলেদের অভীক্ষা সমাধানের পদ্ধতি এবং সাধারণ ভঙ্গী ও ব্যবহারে আমরা বিপুল বৈচিত্র্য দেখতে পাই। কোনও শিশু অধৈর্য্য ও ব্যগ্র, প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধান করতে সচেষ্ট, প্রশংসা পাবার জন্ম উৎসুক। কোনও কোনও শিশু এত ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ে যে, নির্দ্দেশগুলিই ভাল করে শোনে না, অথবা কোনও প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে প্রশ্নটি যথেষ্ট সময় ধ'রে ভালরূপে ভাবে না, সুতরাং সে জন্ম ফলও খারাপ হয়। শিক্ষকেরা, বিশেষতঃ যাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ান, তাঁরা এইরূপ শিশুর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত। আবার এরই বিপরীত আর এক শ্রেণীর শিশু আছে। তাদের আচরণে ধীরতা ও স্থিরতা প্রকাশ পায়, তারা একটিও বাজে কথা বলে না, প্রত্যেকটি কথা বলবার পূর্ব্বে ভাল ক'রে ভেবে বলে। এমন দেখা যায় যে, কোনও শিশু তার নিজের প্রচেষ্টা ও ফলাফলের মূল্য বিচার করতে পারে, আবার অপর এক শিশুর আত্মসমালোচনা বা নিজ সাফল্যের মান বিচার করবার শক্তি মোটেই নেই। একজন হয়ত একটি কঠিন প্রশ্নের সমাধানের জন্ম দৃঢ়চিত্তে বার বার চেষ্টা করছে, আর একজন বিফলতার সামান্য সম্ভাবনাতেই চেষ্টা ত্যাগ করছে। অভীক্ষার সময়ে একজনের বেশ সহজ বন্ধুভাব, পরীক্ষার ভীতি একটুও নেই; অপর জন হয় ত ব্যর্থতা বা সমালোচনার ভয়ে কাঁপছে।

শিক্ষকমাত্রেই লক্ষ্য করেছেন যে এই সমস্ত স্বভাবগত পার্থক্য তাঁর পাঠনায় এবং শ্রেণীগত আচরণে শিশুগণকে কতটা বিভিন্নরূপে প্রভাবিত করে। যে শিক্ষক শিশুদের এই নানারূপ মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া বুঝে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন, শ্রেণীশিক্ষায় তিনি সফল হন। স্বভাব এবং ব্যক্তিত্বের প্রশ্নটিতে মনোবিদ্‌গণ বিশেষরূপ মনোযোগ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে বহু চিত্তাকর্ষক গবেষণা চলছে। কিন্তু শ্রেণীশিক্ষার ব্যাপারে এই সম্পর্কে বিস্তারিত ও নির্ভুল নির্দ্দেশ দেবার মত যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও সংগৃহীত হয় নি। স্বভাবের অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার উন্নতিসাধনও করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিশুদের উপর তার প্রয়োগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, প্রশংসনীয় সাফল্যও পাওয়া যাচ্ছে। এই স্বভাবগত অভীক্ষাগুলির মান এখনও পর্য্যন্ত মানসিক অভীক্ষার মত সুনির্দ্দিষ্ট হয় নি, আর কার্য্যকরীভাবে এগুলির উপর অতখানি নির্ভর করাও এখনও যায় না বটে; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন পূর্ণ বিশ্বাসে এগুলির শুদ্ধভাবে হাতে কলমে ব্যাপক ব্যবহার করা যাবে। প্রত্যেক শিশুর শিক্ষায় কোন পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ, তা স্থির করবার জন্য ভাল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে নিজের প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের উপরই এখন নির্ভর করতে হয়। বহু সপ্তাহ ও মাসের অভিজ্ঞতায় এই জ্ঞান সঞ্চয় করতেই অনেকখানি সময় চলে যায়। তবে শীঘ্রই স্বভাবসম্পর্কিত অভীক্ষার এতখানি উন্নতি হবে যে, শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার সময়ে কোনও মনোবিৎ বা এই কার্য্যে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক তাদের প্রত্যেকের স্বভাবের অভীক্ষা নিতে পারবেন। তার ফলে এইরূপ সময়ের অপব্যয় এবং বহুবিধ ভুল-ভ্রান্তিও বেঁচে যাবে।

বর্ত্তমানে এতখানি বলা যায় যে এই স্বভাবের পার্থক্যগুলিও বুদ্ধিগত পার্থক্যের মতই বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ। আর শিক্ষককেও এই দিকে মনোযোগ দিতে হবে। শিশুদের স্বভাবগত এতটা প্রভেদ থাকাতে এই যুক্তিই সমর্থিত হয় যে, বিদ্যালয়ের পদ্ধতি নমনীয় হওয়া দরকার, এবং শিশুদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়াও আবশ্যক। যে পদ্ধতি একটি শিশুর মধ্যে উদ্যম জাগিয়ে তুলবে, অন্য শিশুর বেলায় তা খুব ফলপ্রসূ না হতে পারে। কোথাও প্রশংসায় কাজ হয়, কোথাও বা সমালোচনার দরকার; কোনও ক্ষেত্রে স্পষ্ট অভিভাবন (suggestion), উপদেশের প্রয়োজন, আর এক ক্ষেত্রে স্বকীয় চেষ্টার স্বাধীনতা দিলেই বেশী কাজ হয়। পৃথক ব্যক্তিগত প্রণালীর পাঠেই এইরূপ প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা খুব সহজে সম্ভবপর হতে পারে।

একটু আগে বিনের বুদ্ধির মানদণ্ডে সাফল্যের বহু বছর বিস্তৃত ব্যাপ্তির কথা হচ্ছিল। এখন তার দ্বিতীয় কারণ, অর্থাৎ শিশুর বিশেষ গুণ ও ত্রুটির কথা আলোচনা করা যাবে। এই প্রসঙ্গটি বড়ই বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর যে সমস্ত বিশেষ গুণ বা দোষ থাকে, সেগুলির প্রভাব তার শিক্ষায় ও পরবর্ত্তী জীবনে শিশুর সাধারণ বুদ্ধিরই সমরূপ সুদূরপ্রসারী হতে পারে। যেমন, সংখ্যাগত স্মৃতি যদি তার অত্যন্ত খারাপ হয়, তবে যুক্তির ক্ষমতা যথেষ্ট থাকলেও পাটীগণিতে তার উন্নতি বেশী হবে না, বিশেষতঃ যদি এই ত্রুটি তার পূর্ব্বে না ধরা পড়ে এবং সেজন্য তাকে বিশেষ সাহায্য না দেওয়া হয়।

একটি বিষয়ে মনোবিদ্‌গণের মধ্যে বহু বিতর্ক হয়েছে, তা হ'ল এই। 'সাধারণ বুদ্ধি' (general intelligence) ব'লে সত্যই কিছু আছে কি? না বিভিন্ন ক্রিয়ার উপযোগী স্বতন্ত্র ও পরস্পর নিরপেক্ষ অনেক

গুলি বিশেষ শক্তিরই সমষ্টিমাত্র আমাদের ভিতরে আছে? এই প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য বহুসংখ্যক পরীক্ষা হয়েছে, পরীক্ষার ফলগুলির নানাবিধ ব্যাখ্যা হয়েছে, তদনুযায়ী বিভিন্ন সিদ্ধান্তও গড়ে উঠেছে। এখন কিন্তু এই কথা বলা চলে যে, সাধারণ বুদ্ধি নামক কোনও গুণের অস্তিত্ব যে রয়েছে, অধিকাংশ পণ্ডিতেরই এই সাধারণ অভিমত। প্রধানতঃ অধ্যাপক স্পিয়ারম্যানের (Spearman) অক্লান্ত মূল্যবান গবেষণার ফলেই এই সিদ্ধান্ত গঠিত হয়। তিনি general intelligence বা সাধারণ বুদ্ধি না ব'লে শুধু আদ্যক্ষর '*g*' দ্বারা গণিতের পদ্ধতিতে এটিকে সূচিত করেন; তার ফলে এই গুণটির তাৎপর্য্য কি, সে বিষয়ে তাঁকে কোনও বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়তে হ'ল না। এছাড়া বহু বিভিন্ন রকমের বিশেষ শক্তি বা গুণও (specific factors) রয়েছে, সেগুলি স্পিয়ারম্যান সংক্ষেপে '*s*' অক্ষর দ্বারা অভিহিত করেছেন। যে কোনও কাজই আমরা করতে যাই না কেন, তার জন্য সাধারণ *g* এবং কোনও না কোনও বিশেষ *s*, উভয়েরই প্রয়োজন হবে।

এইরূপ বর্ণনায় এ সিদ্ধান্ত বড় সূক্ষ্ম ও জটিল তথ্যপূর্ণ মনে হয় বটে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর খুব গুরুতর তাৎপর্য্য আছে; জীবন ও শিক্ষার নানা দিকে এটিকে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা যায়।

বিনের বুদ্ধির মানদণ্ডের বিভিন্ন পরীক্ষায় শিশু কতখানি সাফল্য পাবে, তার মধ্যে এই বিশেষ গুণগুলির স্থান আছে। তবে তার বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার সকল অংশেই এগুলির ক্রিয়া আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। যে কোন বিষয়ই হোক, সঙ্গীত বা গণিত, ছুতোরমিস্ত্রীর কাজ বা মূর্ত্তি গড়া, প্রবন্ধ লেখা বা ইতিহাস ভূগোলের তথ্য আয়ত্ত করা, সকল ব্যাপারেই তার সাফল্যের পরিমাণ এই দুই গুণের জটিল সমষ্টি দ্বারা নির্দ্ধারিত হবে; প্রথমটি *g* বা সাধারণ গুণ,

দ্বিতীয় কোনও না কোনও শ্রেণীর s বা বিশেষ গুণ। বিভিন্ন কাজে কোনও ব্যক্তির সাফল্য থেকে তার gএর মোট পরিমাণ যা পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তির সকল ধরণের ক্রিয়াতেই তা সমান থাকবে, কম বেশী হবে না; কিন্তু একই ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের sএর মধ্যে, অর্থাৎ নানা ধরণের ক্রিয়ায় যে সকল স্বতন্ত্র বিশেষ গুণের প্রয়োজন হয়, সে গুলির পরিমাণে প্রচুর তারতম্য দেখা যায়। ক্রিয়াটির দিক থেকে দেখলে, কোনও ক্রিয়াতে gএর স্থান বেশী, কোনটিতে sএরই প্রাধান্য; অর্থাৎ সকল কাজেই g এবং s উভয়েরই স্থান থাকলেও, কোনটি কি অনুপাতে থাকবে, বিভিন্ন কাজের বেলায় তারও অনেক বৈষম্য পাওয়া যাবে। স্পিয়ারম্যান নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়নে gএর স্থান খুব উচ্চ, এগার ভাগ, আর s মাত্র এক ভাগ; কিন্তু সঙ্গীতনৈপুণ্যের বেলায় sএরই সম্পূর্ণ প্রাধান্য, এখানে g এক ভাগ ও s চার ভাগ। এই থেকে আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞানের একটি কথা সমর্থিত হয় যে, প্রাচীন শাস্ত্র পাঠে কোনও ছাত্রের কৃতিত্ব থেকে তার সর্ব্বাঙ্গীন শক্তিসামর্থ্যের একটা মোটামুটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সঙ্গীতকুশলতা থেকে তা পাওয়া যায় না। তাই যে ব্যক্তি সাধারণ অর্থে খুব বুদ্ধিমান বিবেচিত হন, অনেক সময়ে তাঁর গানবাজনায় দক্ষতা হয়ত আদৌ থাকে না। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, সচরাচর এই বিশেষ গুণগুলির গুরুত্ব সাধারণ গুণের তুলনায় কম হ'লেও, শিশুর শিক্ষায় এগুলির প্রভাব বহুদূরবিস্তৃত হতে পারে।

যে সব পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে g এবং sএর পৃথক প্রভাব নির্ণয় করা হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার স্থান এখানে নেই। তবে এই সকল পরীক্ষায় যে সমস্ত চিত্তাকর্ষক তত্ত্ব পাওয়া গেছে, তার মধ্যে

একটি হ'ল এই যে, বিশেষ গুণগুলির বৈশিষ্ট্য, আমরা যা ধারণা করে এসেছি, তার চেয়ে ঢের বেশী ; অর্থাৎ কোনও এক ব্যক্তির মধ্যে যে সকল বিশেষ গুণ থাকে, তাদের সংখ্যা, এবং সেগুলির প্রত্যেকটির পরিমাণের পরস্পর তারতম্য, উভয়ই যথেষ্ট অধিক। পূর্ব্বে যেমন মনোবিজ্ঞানীরা স্মৃতিশক্তির কথা অনেক বলতেন, ভাল ও মন্দ স্মৃতি, স্মৃতিশক্তি বাড়াবার শ্রেষ্ঠ পন্থা কি, ইত্যাদি। এখনও বিদ্যালয়ে ও সাধারণ জীবনে আমরা এই সব কথা বলি, এমন কি মনোবিদেরাও নিজেদের অসতর্ক মুহূর্ত্তে এমন কথা বলে ফেলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জানা গেছে যে শিশুর বা বয়স্ক ব্যক্তির ভাল বা খারাপ স্মৃতিশক্তি আছে, এমন বলা যায় না ; এমন কি তার যে একটিই স্মৃতিশক্তি, সে কথাও বলা চলে না। স্মৃতি বহু রকমের, তার মধ্যে কোনটি ভাল আবার কোনটি মন্দ হতে পারে। হয় ত শব্দ বা সংখ্যা কানে শুনে মনে রাখবার শক্তি তার কম, অথচ সেগুলিই লেখা হলে তার চেহারা বেশ মনে থাকে। অসংলগ্ন কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি, যেমন কয়েকটি সংখ্যার তালিকা, সে স্মরণ করতে পারে না ; অথচ যে বিষয়ের সুসংলগ্ন অর্থ আছে, যেমন সম্প্রতি পড়া কোনও অনুচ্ছেদের সারাংশ, তার তা বেশ মনে থাকে। হয় ত সে এখনই যা শিখেছে তা সহজে ও নির্ভুলভাবে বলতে পারে, কিন্তু কিছুকাল ভালরূপে স্মরণ রাখতে বা পরে তা বলতে পারে না। যে বিষয়টি তার মনের মত, যাতে তার আগ্রহ, তার অতি ছোট খুঁটিনাটিও হয় ত তার খুব ভাল মনে পড়ে, অথচ এর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোন বিষয় একেবারেই সে মনে রাখতে পারে না। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কথাই যদি ধরা যায়, তাঁর নিজের চিঠিখানি ফেলতেও হয় ত কখনও তাঁর মনে থাকে না ; অথচ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছেলের পড়াশুনার সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে

তাঁর স্মরণশক্তি অভ্রান্ত। কোনও ছেলের ইতিহাসের তারিখ স্মরণ থাকে না ; কিন্তু ঠিক কোন স্থানে গত বছরে এক পাখীর বাসা পাওয়া গিয়েছিল, সে জায়গাটি এ বারে গিয়েও তার বেশ মনে পড়ে গেল। শেষের উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায় যে, এ ধরণের বিশেষ ব্যাপার স্মরণ রাখা কতকটা আগ্রহের প্রভাবে হয়ে থাকে, কিন্তু কোনও কোনও শ্রেণীর স্মৃতি আবার মানুষের সহজাত শক্তির ব্যাপার। এগুলির কোন কোনটির প্রভাব শিশু বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করার সময় থেকেই চলতে থাকে।

আমরা যে 'কল্পনা' কথাটি সর্ব্বদা ব্যবহার করি, সে সম্পর্কেও এই একই বক্তব্য। অনেক সময়েই বলা হয়, শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশ করতে হবে,—যেন এটি একটা স্বতন্ত্র ও সরল শক্তি বা মানসিক প্রক্রিয়া। কিন্তু আসলে কল্পনা বড়ই জটিল, এবং তার অনেকগুলি পৃথক অংশও আছে। গোড়াতেই দেখা যাবে, এর দুটি শ্রেণী আছে। প্রথমে হল প্রত্যক্ষমূলক কল্পনা, যাতে আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি, তারই প্রতিরূপ চিত্রিত হয় ; যেমন মনশ্চক্ষে অর্থাৎ কল্পনার দৃষ্টিতে কোনও স্থান বা ব্যক্তিকে দেখছি, মনে মনে কোনও স্বর বা সঙ্গীতের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। দ্বিতীয়টি হল শিল্পী, কবি বা বৈজ্ঞানিক গবেষকের সৃষ্টিমূলক কল্পনা। এক্ষেত্রে মনে যেটি রূপায়িত হয়েছে, তা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ নয়, নূতন সৃষ্টি, আর উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, সাধারণ বুদ্ধি আর এই শ্রেণীর কল্পনায় শেষ পর্য্যন্ত খুব বেশী প্রভেদ দেখা যায় না। এখন, যাঁর এই প্রথম শ্রেণীর কল্পনায় শ্রেষ্ঠত্ব দেখা গেছে, তাঁর যে দ্বিতীয়টিতেও তা থাকবে, এমন কোনও কথা নেই। শুধু তাই নয়, কেবল প্রত্যক্ষমূলক কল্পনার ক্ষেত্রেও নানারূপ বৈষম্য থাকতে পারে। একজন হয়ত দার্শন প্রতিরূপ (visual image) বা চোখে দেখা জিনিষের বাস্তব স্পষ্ট

রূপটি খুব সুন্দরভাবে স্মরণ রাখতে পারেন, যেমন চিত্রকরের এরূপ স্মৃতিশক্তি থাকে। অন্য আর একজনের হয়ত এই ক্ষমতা আদৌ নেই, কিন্তু তিনি কানে শোনা শব্দের (auditory image) বহু জটিলতা ও পার্থক্য ইচ্ছামত স্মরণ করতে পারেন; যাঁর সঙ্গীতে বিশেষ নৈপুণ্য আছে, এরকম শক্তি তাঁর মধ্যে দেখা যায়। শ্রেণীতে পড়ার সময়ে যে ছেলেটির দৃষ্টিগত স্মৃতি ভাল, সে অন্য যে ছেলের এই শক্তি অল্প, তার চেয়ে সহজে পড়া মনে করতে পারবে, কারণ এক্ষেত্রে দৃষ্টির ব্যবহারই বেশী। আবার যে ছেলের শ্রবণগত স্মৃতি ভাল, কানে শোনা মৌখিক পাঠের বিষয় তার ভাল মনে থাকবে।

বানান শিক্ষায় শব্দের প্রতিরূপের বেলায় ছেলেদের লেখাপড়ায় এই পার্থক্যের গুরুত্ব বোঝা যায়। এমন দেখা যায় যে, কোনও ছেলে যদি বানানগুলি বার বার লেখে, তা হ'লে সত্যই সে সহজে শিখতে পারে, অন্যের পক্ষে আবার মুখে বানান করে শেখা সহজ হয়। এই সব প্রভেদ পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি জেনে নেবার সহজ পন্থা এখনও বেরোয়নি, সুতরাং অধ্যাপনার প্রণালীতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও নমনীয়তা থাকা এইজন্য আরও আবশ্যক।

৬। পঠনে পশ্চাৎপরতা

এখন কয়েকটি সাধারণ বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয় নিয়ে, সেগুলি পড়ার সম্পর্কে কোনও শিশুর কি ধরণের ত্রুটি ঘটতে পারে, তাই আমরা দেখব। প্রথম প্রয়োজনীয় উদাহরণরূপে পঠনশিক্ষার কথাই ধরা যাক।

প্রায় সকল বিদ্যালয়েই সর্ব্বদা এমন শিশু দেখা যায়, যারা ভাল পড়তে পারে না; পড়ার বিষয়ে তারা তাদের বয়সের উপযুক্ত মানের

চেয়ে এক বছর বা তারও বেশী পিছনে আছে। এমন হতে পারে যে, শিশু সকল বিষয়েই পিছিয়ে আছে; সাধারণতঃ যাদের সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধির মান নীচু, তাদের বেলায় এরকম ঘটবে। কিন্তু এমন শিশুও অনেক পাওয়া যায়, যাদের পশ্চাৎপরতা অন্য বিষয়ের চেয়ে পঠনেই বেশী। সে ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় যে তার পিছনে কোনও বিশেষ ত্রুটি আছে। এমন শিশুদের ভালরূপে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এর মূলে নানাবিধ কারণ আছে; কোনও কারণ এক শিশুর বেলায়, অপর কারণ আর এক শিশুর ক্ষেত্রে, প্রবলভাবে ক্রিয়া করছে। এমন খুব কমই দেখা যায় যে কেবল একটি কারণের প্রভাবেই এই দোষ জন্মেছে। এই সম্পর্কে শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাহ্য কারণগুলি প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার।

বই পড়ার ব্যাপারে পিছিয়ে থাকার বাহ্য কারণগুলিও উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। কোন শিশুর বেলায় হয়ত দেখা যাবে যে, সে যখন প্রথম পড়তে শেখা আরম্ভ করেছিল, তখন তার একাধিকবার বিদ্যালয় বদল হয়েছে। সুতরাং এই সময়ের শিক্ষা অবিচ্ছিন্ন না হওয়াতে তার সমস্ত গোল হয়ে গেছে, ঠিক ক'রে পড়তে সে আর শেখেনি। আবার কখনও দেখা যায় যে, ক্রমাগত বিদ্যালয়ে কামাই হওয়ার ফলে শিক্ষাতে বাধা পড়েছে, তার প্রধান ধাপগুলিই বাদ পড়ে গেছে। কোনও শারীরিক ত্রুটি, যেমন দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, বাচনভঙ্গীর দোষ, ইত্যাদির ফলে হয়ত শিশু যে সময়ে প্রথম পড়তে শিখছিল, তখন তার শিক্ষা ঠিক হয়নি; পরে এই শারীরিক ত্রুটি দূর হলেও কিন্তু পড়ার বিষয়ে তার আগেকার প্রভাব স্থায়ীভাবে থেকে গেছে। আবার কোনও বাড়ীতে হয়ত বই বা পড়াশুনার কোনও স্থান নেই, সেখানে শিশু পড়তে শেখার সময়ে কিছুই উৎসাহ বা প্রেরণা পায় না। এরূপ ক্ষেত্রে

সে শিশুর তার সমান বয়স ও বুদ্ধির অন্য শিশুর তুলনায় পিছিয়ে থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

পঠন শিক্ষাদানের একই নির্দিষ্ট প্রণালী খুব বাঁধাধরা নিয়মে অনুসরণ করার ফলেও কোনও কোনও স্থলে পড়ার বিষয়ে অনগ্রসরতা হতে পারে। পড়তে শেখাবার কয়েকটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে ; কোনও শিশু হয়ত তার একটিতে, যেমন শব্দানুক্রমিক পদ্ধতিতে ভাল শিখতে পারে, অন্য শিশুর পক্ষে আবার ধ্বনি বা অক্ষর পদ্ধতি অধিক উপযোগী হতে পারে। আর অল্পবুদ্ধি শিশুদের বেলায় আর একটি ব্যাপার ঘটতে পারে যে, তাদের যদি খুব ছোট বয়সে পড়তে শেখান আরম্ভ করা যায়, যখন সে বিষয়ে তাদের যথার্থ আগ্রহের সঞ্চার হয়নি, তবে তার প্রতিকূল প্রভাবও খুব শক্তিশালী হয়ে থাকে। অধিক বুদ্ধিমান ছেলেদের পড়তে শেখার দিকে আপনা হতেই আগ্রহ হয়, অনেক সময়ে হয়ত তার বাড়ীর ব্যবস্থা থেকেও এ বিষয়ে সে প্রবল উৎসাহ পায়। কিন্তু যে শিশুর বাড়ীর অবস্থা হীন, বা যার বুদ্ধির পরিণতি অল্প, সে পড়তে শেখার বেলায় তেমন কোনও আগ্রহ পায় না। অনুশীলনের অংশগুলি আয়ত্ত করে নেবার উপযুক্ত প্রেরণা যদি তার না থাকে, তবে তার পঠন সম্বন্ধে সহজেই একটা বিতৃষ্ণা ও ভয় আসবে ; সেজন্য তার চেষ্টার ফলও আরও খারাপই হতে থাকবে। সুতরাং শিশুর বুদ্ধি যদি কম হয়, তবে পড়া শিক্ষা দেবার সময়ে, প্রথমে অনুশীলনের দিকে বেশী জোর না দিয়ে, তার আগ্রহ জাগিয়ে তুলাই বিশেষ আবশ্যক ; এবং এই শিক্ষার মূল্য কি, এতে কতখানি আনন্দ পাওয়া যায়, সে বিষয়েও তার যথার্থ ধারণা সৃষ্টি করে দেওয়া দরকার।

পঠনের মধ্যে যে সমস্ত সংশ্লিষ্ট মানসিক ক্রিয়া আছে, সেগুলিরও

বিশেষ কোনও ত্রুটি থাকতে পারে। তেমন ত্রুটির সঙ্গে যুক্ত হ'লে বাহ্য কারণগুলির প্রভাবও আরও শক্তিমান হয়ে থাকে। এই সহজাত ত্রুটিগুলিও একাধিক প্রকারের হতে পারে, কারণ পড়া এক অতি জটিল কার্য্য। এর মধ্যে অনেকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া রয়েছে, যেমন সমগ্র শব্দ ও তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়; ধ্বনিসমষ্টি ও তার অংশগুলির জ্ঞান; ওষ্ঠ ও জিহ্বার কতকগুলি জটিল ক্রিয়ার সমন্বয়সাধন; এই সমস্ত জিনিষের সংযোগ সম্পূর্ণ ক'রে সেগুলির সমগ্র ও আংশিক প্রয়োগ; লিখিত ভাষা এবং তার অর্থের মধ্যে যোগ-সূত্র গঠন এবং সেই পঠিত বিষয়ের অর্থ উপলব্ধি। শেষোক্ত ক্রিয়াটি প্রধানতঃ সাধারণবুদ্ধির ব্যাপার। মেধাবী ছেলের এ বিষয়ে কোনও অসুবিধা হয় না, কিন্তু বুদ্ধিহীন শিশুর পক্ষে এইটিই সব চেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পঠনশিক্ষার অনুশীলনের দিকটা কখনও কখনও বুদ্ধিমান শিশুর পক্ষেও ক্লেশকর হয়ে থাকে, কারণ এইখানেই সহজাত বিশেষ ত্রুটিগুলির প্রভাব থাকে।

এই ত্রুটি নানারূপ হতে পারে। পড়তে শেখার সময়ে শিশুদের যাঁরা মন দিয়ে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা এগুলির বৈচিত্র্য কিছু কিছু দেখেছেন। শিশুর হয়ত চোখে দেখে আকারের পার্থক্য নির্ণয় করার শক্তি কম, সুতরাং যে অক্ষর ও শব্দগুলির চেহারায় সামান্যও সাদৃশ্য আছে, সেগুলি মিলে গিয়ে তার ভুল হয়। অথবা তার ধ্বনির প্রভেদ বোঝবার ক্ষমতা অল্প; অতএব যে সমস্ত শব্দের উচ্চারণ প্রায় এক রকম, সেগুলির পার্থক্য ঠিক রাখা, অথবা জাত শব্দের মধ্যে স্বতন্ত্র ধ্বনিগুলি বিশ্লেষণ করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। আবার কখনও দেখা যায় যে, শব্দটি প্রত্যক্ষ দেখা বা শোনার ব্যাপারে ভুল হয় না, কিন্তু পরে সেই অক্ষর ও শব্দের চোখে দেখা আকার বা কানে শোনা

ধ্বনিটি স্মরণ করার বিষয়ে অক্ষমতা রয়েছে। কখনও কখনও এই স্মরণশক্তির ভুল সঙ্গে সঙ্গে হয় না, কিছু দেরীতে হয়। অর্থাৎ এখন হয়ত দেখা গেল যে শিশুর পাঠ ভালই হয়েছে, কিন্তু সে যা শিখল তা মনে রেখে পরে বলতে পারে না। এ ছাড়াও কোনও কোনও ছেলের এক সাধারণ ভাষাগত ত্রুটি দেখা যায়, যার বেলায় উপরের কোনও কারণ খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সে শব্দ ও বাক্যগুলির সংযোজন ও বিশ্লেষণ করতে পারে না, যদিও তার সাধারণ যুক্তির ক্ষমতা এবং বুদ্ধি স্বাভাবিক পর্য্যায়ে পড়ে। অবশ্য এগুলিতে প্রক্ষোভ বা অনুভূতিমূলক কোনও প্রবল কারণ আছে বোঝা যায়, তারই ফলে ভাষা এইভাবে রুদ্ধ হয়।

এই প্রক্ষোভমূলক কারণসমূহের গুরুত্ব যে কতখানি, যাঁরা পড়ায় পিছিয়ে থাকা ছেলেদের নিয়ে পরীক্ষা করছেন, ক্রমশঃই স্পষ্টরূপে তাঁরা সে কথা প্রমাণ করছেন। অনেক ছেলের বেলাতেই দেখা যায় যে তাদের পড়ায় পশ্চাৎপরতার একটি মাত্র কারণ, আত্মবিশ্বাসের অভাব। কোনও শিশু বিদ্যালয়ে একেবারেই পড়তে পারে না, অথচ হয়ত দেখা যায় যে, সে দক্ষ ও সহানুভূতিশীল মনোবিদের কাছে বেশ পড়তে পারল; শিশু নিজের এই কৃতিত্বে নিজেই বিশ্বাস করতে পারে না। পঠনের ত্রুটি সংশোধন সম্পর্কে গবেষণায় আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দেখা গেছে। অনেক সময়ে হয়ত মনোবিদের শিক্ষায় শিশুর বিশেষ দোষটি দূর হ'ল, এবং সে নিজ বয়সের উপযুক্ত মানে উন্নীত হ'ল। কিন্তু বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে আবার সে পড়তে পারে না। এই থেকে বেশ বোঝা যায় যে, অন্য অধিকাংশ শক্তির সঙ্গে পড়বার ক্ষমতাও শুধু একটা অভ্যাসগত যান্ত্রিক ব্যাপার নয় যে, একবার আয়ত্ত হ'লে চারদিকের সামগ্রিক পরিবেশ যাই হোক না কেন, এই বিদ্যা প্রয়োগ করা

যাবে। যে শিশু সবে বড় হয়ে উঠছে, অন্ততঃ তার পড়তে পারার সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করবে সে কোথায়, কখন পড়ছে, কে পড়া শুনছে, সেখানে কি অবস্থা রয়েছে, এই সবের উপর। সুতরাং কোনও বিশেষ অভ্যাসগত ত্রুটির চেয়ে এখানে প্রক্ষোভগত অবস্থারই প্রভাব রয়েছে। এই সমস্ত থেকে ভালভাবেই জানা যায় যে, পড়তে শেখায় যে সব শিশুর দেরী হয়, তাদের খুব সহানুভূতিসহকারে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অতি গুরুতর। যে পর্য্যন্ত না তাদের মনে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাগে, ততক্ষণ বিশেষ ধৈর্য্যের সঙ্গে সহজ ক'রে তাদের পড়িয়ে যাওয়া উচিত।

৭। পাটীগণিতে পশ্চাৎপরতা

পঠনের বিশেষ ত্রুটিগুলি সম্পর্কে উপরে যা বলা গেল, তা থেকে দেখা যায় যে, পশ্চাৎপরতার আসল কারণটি নির্ণয় করাই বিশেষ দরকার; তা হ'লে যথোপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা সে ত্রুটি সংশোধন করা যায়। এখন বিদ্যালয়ে পাটীগণিতে পিছিয়ে থাকার সমস্যাটিও সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করা যাক।

এক্ষেত্রেও প্রশ্নটি খুবই জটিল। কারণ, অঙ্কের নানা প্রশ্নে বিভিন্ন ধরণের বহু মানসিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়; তার মধ্যে কতকগুলিতে যথেষ্ট বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, আবার অন্যগুলিতে নিয়মের পুনরাবৃত্তিই বেশীর ভাগ থাকে। পাটীগণিত শিক্ষার বেলাতেও আমরা দেখতে পাই যে, এক দিকে গৃহ ও বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব সক্রিয় রয়েছে, অপর দিকে শিশুর স্বকীয় মনীষা ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রভাবও যথেষ্ট। প্রথম বাহ্য কারণগুলি আগে ধরা যাক।

গরীব বা হীন অবস্থার বাড়ীর ছেলেদের সংখ্যার ধারণা এবং অবস্থিতির তুলনামূলক জ্ঞান প্রায়ই কম দেখা যায়। তার একটি প্রধান কারণ এই যে, সঙ্গতিপন্ন অবস্থায় পালিত শিশুরা প্রথম থেকেই যে সব নানা রকমের খেলার সামগ্রী স্বাভাবিক ভাবে পায়, এ বেচারীরা তা পায় নি; তাই সেগুলির সাহায্যে এই শক্তির বিকাশ হবার স্থযোগ তাদের ঘটে নি। এই সঁব খেলনার মধ্যে থাকে গণনা ও গঠনের জিনিষ, শিল্পের নমুনা বা প্যাটার্ণ ও হাতের কাজ, ইত্যাদি; এ সবেতেই সংখ্যা, আয়তন ও আকারের বিশেষ প্রাধান্য থাকে। এগুলি না পাওয়ার ফলে সংখ্যা সম্বন্ধে তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মায় না, সংখ্যাগুলির পরস্পর সম্পর্ক বুঝতে গেলে স্থূল বস্তু নিয়ে যেমন নাড়াচাড়া করা দরকার, তাও তাদের ভাগ্যে ঘটে না। এইজন্য নার্সারি এবং শিশুশ্রেণীর একটি প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল যে, শিশুদের এই অভাব পূরণ করবার জন্য যেন নানাবিধ সংখ্যা ও জ্যামিতির খেলনা নিয়ে তাদের অবাধে খেলা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

এ ছাড়া, বাড়ীর দীন দশা শিশুর পক্ষে ক্লেশকর। আহার ও নিদ্রা অনিয়মিত, অপ্রচুর; ছোট মেয়েটিকে আরও ছোট ভাই বোনদের দেখতে হচ্ছে; ছেলেকে হয় ত সারাক্ষণই নানা ফরমাসে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। এইরূপ ক্লান্তি ও পুষ্টিহীনতার প্রভাব অন্যান্য বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয়ের চেয়ে পাটীগণিতেই আগে দেখা যায়। অঙ্কে উন্নতি করতে গেলে পাঠে একাগ্র মনোযোগ এবং অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা ও অভ্যাস দরকার। অল্পভুক্ত, শ্রান্ত ছেলের পক্ষে তা সম্ভব নয়। অঙ্কটি বেশ বড় হলে এমন শিশু তাতে শেষ পর্য্যন্ত মনঃসংযোগ করে থাকতে পারবে না, মাঝখানে যদি তার চিন্তাসূত্র হারিয়ে যায়

বা ভুল হয়ে যায় ত সব নষ্ট হয়ে গেল। অঙ্কের কোনও গুরুতর অংশ যখন বুঝান হচ্ছে, সে সময়ে যদি মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনস্ক হয়ে সে সূত্র হারিয়ে ফেলে, তবে পরবর্ত্তী অংশের ধারণা তার একেবারে অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হবে।

বিদ্যালয়জীবনে বার বার বিদ্যালয় বদল, ক্রমাগত ও দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলেও অঙ্কশিক্ষায় দেরী হয়, তাতে ত্রুটিও থেকে যায়; কারণ এমন অবস্থায় প্রায়ই শিক্ষার প্রধান ধাপগুলি বাদ পড়ে যায়, আর অঙ্কগুলির নিয়মিত ও যথেষ্ট অভ্যাসও তার হয় না। আর একটি কারণ হ'ল, তাড়াতাড়ি উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়ে দেওয়া। শিশুর সাধারণ দক্ষতা বা ভাষার জ্ঞান ভাল থাকলে তাকে উচ্চ শ্রেণীতে দেওয়া হয়। কিন্তু এদিকে আমাদের বিশেষ যত্ন না থাকলে দেখা যায় যে, তার অঙ্কশিক্ষা অব্যাহত এবং ক্রমোন্নত পর্য্যায় অনুসারে হচ্ছে না, কতক দরকারী জিনিষ তার বাদ গেছে। অঙ্কে পিছিয়ে থাকা সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে এমন অনেক শিশু দেখা যায় যে, যারা কোনও বিশেষ প্রক্রিয়ায়, প্রায়ই বিয়োগ বা ভাগের অঙ্কে কাঁচা। এমন ক্ষেত্রে শিশুর ভুলও প্রায় সবই এক ধরণের, আর সর্ব্বদাই এ ভুলগুলি হয়। সাধারণতঃ অঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশের কোনও একটি ধাপ না বোঝার ফলেই এরূপ হয়। অন্য কারণে হলে ভুলগুলির মধ্যেও অধিক বৈষম্য দেখা যেত।

ছেলেদের পাটীগণিত শিক্ষা আর একটি কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়; তা হচ্ছে, এই বিষয়টি শেখাবার সময়ে শিশুদের হাতে কলমে কাজের সঙ্গে এর যোগস্থাপন কতদূর করা হয়—যেমন হাতের কাজ, জ্যামিতি ও ভূগোলের ক্রিয়া, বাজার ও বাড়ীর কাজ। প্রাথমিক শিক্ষার বয়সের শিশুদের ঝোঁক ব্যবহারিক ব্যাপারের দিকেই বেশী

থাকে। সূত্র ও নিয়মগত সমস্যা তাদের মনে বিশেষ সাড়া জাগায় না, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলিই তাদের ক্ষেত্রে জীবন্ত ও প্রভাবশালী। শিশু যা শেখে, তা যদি হাতে কলমে প্রয়োগ করবার সুযোগ পায়, তবে সে শিক্ষা দ্রুত ও নির্ভুল হয়। অঙ্ক শেখাবার সম্পর্কে এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত; কারণ অঙ্কের মধ্যে এমন বহু প্রক্রিয়াই আছে, যেগুলি শিশু মনের পক্ষে বড় সূক্ষ্ম ও জটিল। এই জন্য পাটীগণিত শিক্ষাপ্রণালীর যে কোনও সংস্কারই হয়েছে, তাতেই অঙ্কের মধ্যে স্থূল দ্রব্য ও ক্রিয়ার অধিক ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রে আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই শিক্ষাপদ্ধতিতে ছোট ছেলেদের অঙ্ক শিক্ষাদানে বহু প্রকারের বাস্তব ও চিত্তাকর্ষক ক্রিয়ার অবতারণা করা হয়, তার মধ্যে গণনা, হিসাব, মাপ, ইত্যাদি সব থাকে।

আবার পিছিয়ে পড়া ছেলেদের খুব বেশী লিখিত অঙ্ক করালে, তাদের অনেক সময়ে মন্দ ও ভুল অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে যায়, ফলে তাদের উন্নতি আরও বাধা পায়। ক্ষুদ্র ও মন্থরগতি শিশুদের পক্ষে সংখ্যার খেলাগুলি খুবই সহায়ক। সংখ্যার খেলাতে যে শুধু তাদের অনুকূল মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা নয়, মুখে মুখে তাড়াতাড়ি যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করবার অভ্যাসও যথেষ্ট হয়।

শিশুর সহজাত ত্রুটিগুলির কথা এখন চিন্তা করা যাক। সংখ্যার শ্রবণগত স্মৃতি, অর্থাৎ সংখ্যা শুনে মনে রাখবার ক্ষমতা কম থাকলে অনুশীলনের অঙ্কে বিশেষ অসুবিধা হয়; তার ফলে বুদ্ধিমান শিশুর উন্নতিও বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। এই অক্ষমতার জন্য শিশু ভয়ানক

পিছিয়ে পড়েছে, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ; অল্পমাত্রায় এ ত্রুটি থাকলেও শিশুর পাটীগণিতশিক্ষার সর্ব্বদাই ক্ষতি হতে পারে।

আবার দেখা যায় যে, কোনও কোনও শিশু সংখ্যার ন্যায় সাঙ্কেতিক চিহ্নের সঙ্গে ধারণার অনুষঙ্গ বা সংযোগ রাখতে পারে না। অঙ্কের সব অনুশীলনেই এরকম সংযোগ দরকার হয় ; আর সে সরল হিসাবগুলি যদি সহজে ও তাড়াতাড়ি করতে না পারে, তবে জটিল প্রক্রিয়াসমূহ আয়ত্ত করায় তাকে বেগ পেতে হয়।

মাঝে মাঝে এমন ছেলে দেখতে পাওয়া যায় যার বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে, যেমন পাঁচ ও দশের, পরস্পর সম্পর্ক বোঝবার শক্তি কম ; যদিও বাস্তব জীবনে, নিজেরই হাত পায়ের আঙুল থেকে এই সংখ্যাগুলির কার্য্যকরী ব্যবহার ও তাৎপর্য্যের পরিচয় পাবার সুযোগ সর্ব্বদাই রয়েছে। সুখের বিষয় এই যে, এর বিপরীত এমন শিশুও আছে যাদের এই সংখ্যার সম্পর্ক বোঝবারই বিশেষ ক্ষমতা থাকে, খুব ছোট বয়স থেকেই তারা এতে আনন্দ পায়।

অঙ্কশিক্ষার সম্পর্কে যে সব সহজাত ত্রুটি দেখা যায়, তার মধ্যে এইগুলিই প্রধান। এর মধ্যে যে কোনটি থাকলে শিশু প্রথম থেকেই অন্যদের মত শীঘ্র ও অক্লেশে এগোতে পারে না। আর অঙ্কে এক ভ্রান্তি থেকে অন্য ভুলের সৃষ্টি হয়। গোড়ায় না বোঝার ফলে পরবর্ত্তী শিক্ষারও ক্ষতি হয়। তখন অধিক শিক্ষা ও অভ্যাসেও কাজ হয় না ; তবে তার ত্রুটি লক্ষ্য ক'রে তদনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করলে সুফল হয়।

সহজাত বুদ্ধির ত্রুটির মত প্রক্ষোভ বা অনুভূতিমূলক কারণেও ছেলেরা অঙ্কে পিছিয়ে পড়তে পারে ; অন্য সব বিষয়ের তুলনায় পাটীগণিতের বেলায়ই এটি বেশী দেখা যায়। এমন কি কোনও

কোনও আধুনিক গবেষক এক্ষেত্রে প্রথমটির, অর্থাৎ মনীষাগত ত্রুটির বিশেষ কোনও প্রাধান্য আছে কিনা, তাতেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বরং এই কথাই বিশ্বাস করেন যে, সাধারণভাবে অল্পবুদ্ধি শিশু ছাড়া অন্য ছেলেরা যখন অঙ্কে পিছিয়ে থাকে, প্রায় সর্ব্বদাই তার কারণ এই যে তাদের বুঝবার চেষ্টায় কোনও 'বাধ' রয়েছে, অর্থাৎ কোনও প্রবল অনুভূতি সম্পর্কিত কারণে তাদের বুঝার চেষ্টা বাধা পাচ্ছে। এর মূলে থাকতে পারে ভয় ও আত্মবিশ্বাসের অভাব, কিংবা গোড়ার দিকের ভুল শিক্ষা, উভয় একসঙ্গেও হতে পারে।

যে শিশুর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বা ত্রুটি আছে, সে সহজে শিক্ষক যা বলছেন, তার দিকে মনোযোগ রাখতে পারে না। একটি অঙ্কের মাঝখানে তার মন সহজেই অন্যদিকে চলে যায়, সুতরাং অঙ্কের প্রথম ভাগ ঠিক হ'লেও বাকীটুকু ভুল হয়ে যায়। বিয়োগ করতে হবে, সে কথা ভুলে গিয়ে সে হয় ত যোগ বা গুণ করতে লেগে যায়। এই সব অযত্ন ও অমনোযোগ ধরা পড়ায় সে তিরস্কৃত হয়, সেজন্য সমগ্র বিষয়টিতে যেন তার পক্ষে লজ্জা ও দুঃখের ছায়া এসে পড়ে। এই ভাবে অনেক শিশুরই অঙ্কের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা এসে যায়, আর অঙ্কে তারা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাফল্য পায় না। এমন সকল ক্ষেত্রেই তাদের ভুলের মধ্যে কোনও নিয়ম বা নিশ্চয়তা থাকে না, তবে ভুল প্রায়ই হয়। অঙ্কের মধ্যে যে সব বাঁধা নিয়মের অনুশীলন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, এই শ্রেণীর শিশুদের সেগুলি অসহ্য, বিরক্তিকর ও একঘেঁয়ে লাগে।

এক্ষেত্রে প্রতিকার এইভাবে হতে পারে যে, শিশু যা কিছু শিখছে, ব্যবহারিক কাজে তাকে তা প্রয়োগ করতে দিয়ে তার মনে যথার্থ আগ্রহের সঞ্চার করতে হবে। তার নিজের পছন্দমত কোনও

কার্য্য সম্পর্কিত হিসাবে বিশুদ্ধতা ও ক্ষিপ্রতার মূল্য যে কতখানি, সে ধারণা তার হয়ে গেলে, সে জন্য খাটতেও সে প্রস্তুত হবে। এর চেয়েও আরও গুরুতর প্রয়োজন হ'ল এই যে, তাকে তার নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে দিয়ে, আর কঠিন কোনও প্রক্রিয়া আরম্ভ করবার আগে গোড়ার সহজ জিনিযগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করিয়ে নিয়েঁ, তার মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। আজকাল নিজে নিজে শিক্ষা করবার জন্য নানাধরণের চিত্তাকর্ষক সামগ্রী হয়েছে, এই সব ছেলের পক্ষে সেগুলি বড়ই সহায়ক। শ্রেণীতে একত্র পাঠের সময় এরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বলস্নায়ু শিশুরা অন্য শিশুদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় ভয় পেয়ে যায় ব'লে তাদের কাজ ভাল হয় না। কিন্তু একা সে পাঠ নিয়ে বসলে সেটিই শুধু তখন তার চিন্তার বিষয় থাকে, আর সত্যিকার ঝোঁক জন্মালে তার উন্নতিও বেশ ভাল হয়।

সুতরাং পাটীগণিত শিক্ষাদানে, শ্রেণীর শিশুদের উন্নতির বৈষম্য এবং বিশেষ ধরণের ত্রুটিগুলি দূর করতে গেলে, নানাবিধ ব্যবস্থার দরকার হয়। অঙ্কের জন্য শ্রেণীর মধ্যে পৃথক পৃথক বিভাগ ক'রে, যাদের অসুবিধা এক রকমের, তাদের একত্র রাখতে হয়। আবার ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং উপযোগী শিক্ষাসামগ্রীর ব্যবস্থাও চাই।

এই সম্পর্কে শিশুর স্বকীয় আগ্রহের গুরুত্ব কতখানি, সে উল্লেখ আগে করা হয়েছে। অঙ্কের কোনও বিশেষ অংশে দক্ষতা বা অক্ষমতার মূল কারণ অনেক স্থলেই হচ্ছে আগ্রহ, বিদ্যালয়ের শিক্ষায় এবং বাস্তব জীবনেও তা দেখা যায়। এক শিশুর যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এখন আমরা দেখছি, কোনও বিষয়ে ঝোঁক থাকার ফলেই হয় ত তার উৎপত্তি হয়েছিল; তারপর বাহ্য কারণ এবং শিশুর নিজের সহজাত গুণসমূহ, উভয়ের প্রভাবে তা বেড়ে উঠেছে। এর

দৃষ্টান্তরূপে আমরা উল্লেখ করতে পারি, যন্ত্রঘটিত জ্ঞানে ছেলে ও মেয়েদের প্রভেদের কথা। যে অল্প কয়টি ক্রিয়ায় উভয়ের সামর্থ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রমাণিত হয়েছে, এটি তাদেরই অন্যতম। যন্ত্রের ক্রিয়া ও যান্ত্রিক সম্পর্ক মেয়েদের চেয়ে যে বেশীর ভাগ ছেলে ভাল বুঝে, সে কথা সুনিশ্চিত। কিন্তু বহু মনোবিৎ মনে করেন যে, এটি প্রকৃতপক্ষে তাদের সহজাত শক্তির কোনও পার্থক্যের জন্য নয়; তাদের আগ্রহ বিভিন্ন দিকে যায় বলেই প্রধানতঃ এই প্রভেদের সৃষ্টি হয়। এই আগ্রহের পার্থক্য খানিকটা অভিভাবন নির্দ্দেশ ও পরিবেশের প্রভাবে হয়েছে, আবার খানিকটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও জন্মগত মনে হয়। ছেলেরা জিনিষ টুকরো টুকরো ক'রে তার কাজ কি ভাবে হয়, দেখতে ভালবাসে। মেয়েদের সেবা করতে ও যত্ন করতে শিখতে হয়, সব জিনিষকে, বিশেষতঃ প্রাণীদের ভালবাসতে হয়। সুতরাং জিনিষের ভিতর খুলে তার অংশগুলির ক্রিয়া দেখবার আকাঙ্ক্ষা তাদের শৈশবেই রুদ্ধ হয়ে যায়। কোনও দ্রব্য ভেঙে টুকরো করতে তাদের সঙ্কোচ হয়, এ যেন একপ্রকার নিষ্ঠুরতা। খুব অল্পবয়সেই তাদের আগ্রহ ও প্রেরণা এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ব'লে তাদের কর্ম্মের অভিজ্ঞতাও সেই বাঁধা পথটিতেই চলে, তারই ফলে এক ধরণের জ্ঞান ও দক্ষতা তাদের হয়, আবার অন্য প্রকার, অর্থাৎ যন্ত্রগত জ্ঞান হতে পারে না। এই ভিত্তিতেই তাদের পরবর্ত্তী জীবনের বিশেষ আগ্রহ ও শক্তিগুলি পরিণতি লাভ করে।

খুব সম্ভবতঃ ভাষার নৈপুণ্যও শৈশবে অর্জ্জিত আগ্রহের ফল। কোনও শিশু খুব ছোট বয়স থেকেই ভাষার শব্দ ভালবাসে, নানাভাবে সেগুলি ব্যবহার করে, এবং আরও বড় বয়সে সূক্ষ্ম রচনাকৌশল দেখিয়ে সে আনন্দ পায়। আবার আর এক শিশুর কাছে এ সব

নিরর্থক. সে হয়ত হাতে কাজ করে, অথবা বস্তুজগতের নানা তথ্য আবিষ্কার ক'রে খুসী হয়। খুব অল্পবয়স্ক শিশুদের মধ্যেও দেখা যায় যে, মানুষের চেয়ে প্রাকৃতিক জগতের দিকেই কারও কারও ঝোঁক বেশী, আবার অপরগুলির বিশেষভাবে মানুষের ব্যাপারেই যেন এক নাটকীয় আগ্রহ দেখা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসার বয়সের আগেই তাদের নিজস্ব আগ্রহ অনুযায়ী জ্ঞান ও দক্ষতার পথও নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়, সেই ভাবে তারা হাতের কাজে, অঙ্কে, নাটক ও সাহিত্যে, সঙ্গীত ও নৃত্যভঙ্গীতে বা চিত্রাঙ্কণে সাফল্য অর্জ্জন করে।

শিশুদের এই পার্থক্যের আলোচনায় আমরা মানসিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের আভাস পেয়েছি, তা হচ্ছে বোধ এবং উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ, অর্থাৎ একদিকে জ্ঞান ও অপরদিকে ইচ্ছা ও অনুভূতির পরস্পর সম্পর্ক। জানা, ইচ্ছা করা ও অনুভব করা তিনটিই মানসিক ক্রিয়ার অন্তর্গত ; উপরে আমরা দেখেছি যে জ্ঞান কি ভাবে ইচ্ছা ও অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

শিশুদের বিশেষ শক্তি ও আগ্রহ সমূহের এই প্রভেদের উৎপত্তি ঠিক কি কারণে হয়? মনোবিদেরা তার ব্যাখ্যা যেমনই করুন, শিশুদের যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সম্পূর্ণ সুফল পেতে হয়, তবে তাদের শিক্ষক হিসাবে আমাদের এগুলির কথা মনে রেখে তদুপযোগী ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক বিকাশ

১। শিশুর চঞ্চলতা

সমবয়সী শিশুদের মধ্যে যে সব পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, ইতিপূর্ব্বে প্রধানতঃ তারই আলোচনা হয়েছে; এখন তাদের মধ্যে সাদৃশ্য কি আছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়ঃসীমার মধ্যে যখন তারা বড় হতে থাকে, তখন তাদের আচরণে কি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তার কথা চিন্তা করা যাবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের কথা সম্পূর্ণ মনে রেখেও আমরা দেখতে পাব যে এই বয়সের সব শিশুর চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়ার একটা নিজস্ব রীতি আছে। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনাতেও শিশুদের এই সাধারণ প্রয়োজনগুলির কথাই বেশী ক'রে ভাবতে হয়।

অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষা বয়সের সমস্ত সাধারণ লক্ষণগুলি কোনও একটি শিশুর মধ্যে দেখা যায় না। সত্যিকার কোনও শিশুকে এবিষয়ে 'গড়' বা 'দৃষ্টান্ত' ধরা চলে না। বাস্তব ক্ষেত্রে যে সব শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাদের সকলের মধ্যে সচরাচর কোন গুণগুলি বর্ত্তমান থাকে, শুধু তার একটা ধারণা দেওয়াই হচ্ছে মনোবিদ্যার এই সকল তথ্যের অভিপ্রায়। কোনও কোনও মনোবিৎ 'শিশু' কথাটি এরূপ ভাবে ব্যবহার করেন যেন শিশুর একটা স্থির নির্দ্দিষ্ট আদর্শ আছে; বাস্তব জগতের আমাদের জানা সব শিশুদের ভিতর থেকে সেটি, কোনও গূঢ় প্রণালীতে টেনে বার করা হয়েছে।

এর ফলে অনেক সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম রচিত হয়, শিক্ষার সব বাঁধাধরা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু যিনি কাজের লোক, শ্রেণীতে ছেলেদের পড়াবার সময়ে তাঁর এগুলি বিশেষ কোনই কাজে লাগে না। সুতরাং এই গ্রন্থে আমরা কোনও বিশেষ শিশুর কথা না চিন্তা ক'রে, সাধারণভাবে সব শিশুর কথাই মনে রাখতে চাই; আর প্রতিপদে ঐ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বিভিন্ন শিশুর বেলায় এই সাধারণ নিয়ম থেকে বহু রকমের ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে।

এই ব্যক্তিগত প্রভেদের বিস্তারিত বিবরণ আগেই দেওয়া গেছে। সুতরাং এখন শিশুর এ বয়সে বেড়ে উঠার সাধারণ নীতি কিরূপ, তা নিয়ে আলোচনা করলে আর পাঠকের পক্ষে তা বিভ্রান্তিকর হবে না।

নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার বয়সের শিশুদের প্রথম উল্লেখযোগ্য সাধারণ লক্ষণ এই যে, সর্ব্বদা তারা নড়াচড়া করতে চায়। তাদের ছেড়ে দিয়ে একটু সুযোগ দিলেই দেখা যায় যে নানা দৈহিক ক্রিয়ার প্রতি তাদের অক্লান্ত আসক্তি। তারা দৌড়ায়, লাফায়, উঁচুতে চড়ে, দোল খায়, চেঁচায়, গান করে, যাতে তাদের হাত পা ও সারা দেহের চালনা রয়েছে, এমন সব খেলা বার ক'রে তারা সর্ব্বদাই খেলে। বিদ্যালয়ে তারা বাধ্য হয়ে স্থিরভাবে বসে থাকে; যে মুহূর্ত্তে তারা ছাড়া পায়, তৎক্ষণাৎ এক দৌড়ে তারা খেলার মাঠে পৌঁছে ছুটোছুটি করতে লেগে যায়; এ দৃশ্য সকলেই দেখেছেন। তাদের স্বাভাবিক প্রেরণার বশে হাত পা ও জিহ্বা সর্ব্বদাই নড়ছে। পৃথিবীতে চলবার এই তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত রীতি, এই ভাবেই তারা বেড়ে উঠে।

মনোবিদের পরীক্ষার পদ্ধতিতে শিশুর বৃদ্ধির ব্যাপারটি খুব ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করলে, সাত বছরের নিম্নবয়স্ক শিশুদের মত,

প্রাথমিক শিক্ষা বয়সের সাত থেকে এগার বছরের ছেলেরাও সর্ব্বক্ষণ এই ক্রিয়াচাঞ্চল্য অনুভব করে কেন, তার কতকগুলি কারণ বোঝা যায়। এই বয়সে তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির পরিণতি বা অঙ্গপেশীগুলির নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়সাধন সম্পূর্ণ হতে দেরী থাকে। যেমন, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সাত থেকে এগার বছর বয়সের মধ্যে বাড়তে থাকে। দৈহিক ক্রিয়াতে পটুতার জন্য যে শক্তিটি সব চেয়ে দরকার, তার নাম পেশীয় বেদন (muscle sense), অর্থাৎ পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদিতে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় সাহায্যে নিজ শরীরের সঞ্চলন অনুভব করার শক্তি, বার তের বছর পর্য্যন্ত এই শক্তি পুর্ণ সূক্ষ্মতা লাভ করে না। নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া, যেমন টোকা মারা বা লেখার বেলায় দেখা যায় যে, সাত থেকে দশ বছর পর্য্যন্ত তার গতি তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে, তারপর ধীরে ধীরে কমে আসছে; আবার ঠিক এই বয়সের মধ্যে নির্ভুলতার দিক থেকেও ক্রিয়ার বিশেষ উন্নতি হয়। তারপর কৈশোর (adolescence) পর্য্যন্ত উন্নতি অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে চলে।

সুতরাং কেবল খুব ছোট বয়সের শিশুদেরই যে জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলির বিকাশ ও দৈহিক পটুতা অর্জ্জনের উপযোগী অনুশীলনের সুযোগ দরকার, তা নয়; সাত থেকে এগার বছরের মধ্যেও সে প্রয়োজন তার চেয়ে কিছু কম থাকে না। এই বয়সে শিশুরা আগেকার তুলনায় আরও অনেক কাজ করতে পারে বটে, কিন্তু দৈহিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা তাদের সমান রয়েছে। তাদের শরীরের পেশীগুলি চালিত হতে চায়, জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ নূতন নূতন অভিজ্ঞতা চায়, শুধু তাদের নিজেদের ক্রিয়ার সাহায্যেই তাদের শিক্ষা হতে পারে। ছোটদের পক্ষে দেহ চালনা বড়দের মত কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী ব্যায়ামচর্চ্চা বা শুধু নিজের আনন্দের জন্য নয়। অবশ্য

ব্যায়াম ও আনন্দও আছে বটে, কিন্তু তাদের শিক্ষার জন্যও এর প্রয়োজন। শারীরিক অনুশীলন না হলে তাদের দক্ষতা, শক্তি ও তীক্ষ্ণতার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে না ; তা ছাড়া তাদের বোধ ও যুক্তিরও অবাধ বিকাশ হতে পারে না। সে কথা পরে বোঝা যাবে।

সুতরাং শিক্ষকের প্রথম গুরুতর কর্তব্য এই যে, শিশু যাতে যতখানি সম্ভব অবাধে ও অধিক মাত্রায় দেহ চালনার সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা যেন তিনি করেন। যখন আমরা শিশুদের নড়তে মানা করব, তার যেন যথেষ্ট কারণ থাকে ; শুধু শুধু এমন আদেশ করা অন্যায়। মনে রাখতে হবে যে শিশুদের স্থির হয়ে থাকারই উপযুক্ত কারণ থাকা চাই, নড়াচড়ার নয়, কারণ সেইটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। স্থির হয়ে থাকার যদি যথার্থ প্রয়োজন থাকে, কোনও নির্দ্দিষ্ট সুফল অভিপ্রেত হয়, তবেই স্থির থাকতে বলা উচিত ; কারণ শিশুর পক্ষে অকারণ চুপ করে বসে থাকা সদ্‌গুণ নয়, তার দ্বারা যখন কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখনই এটি সদ্‌গুণ বলা চলে। এই বয়সে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে যে, শিশুরা যেন বাড়তে ও পরিণতি লাভ করতে পায়, আর কোনও না কোনও রকমের ক্রিয়াই হচ্ছে তার একমাত্র পন্থা। শিশুর এই অবিরাম ক্রিয়াচাঞ্চল্য সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শিক্ষাসংস্কার" প্রবন্ধে লিখেছেন, "ছেলেদের যাহারা যথার্থ হিতৈষী তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির শুভ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা ইহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না।" আর একটি জায়গায় তিনি লিখেছেন, "এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায়, তবে ইহাই একদিন চরিত্র এবং বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে।"

প্রায় সাত বছর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত দেহের বৃহৎ সন্ধি ও পেশী-সমূহের, যেমন জানু এবং কাঁধের, সমন্বয় বেশ ভালভাবে হয় না। সব কাজেই এই ব্যাপারটির গুরুত্ব খুব বেশী, কারণ এই পরিণতি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহের ক্ষুদ্রতর সন্ধি ও পেশীগুলির ক্রিয়াসমন্বয়, হাতের আঙ‍ুল ও কব্জির নিপুণ চালনা, চোখের সূক্ষ্ম ক্রিয়া, এমন কি কথা বলা ও গান গাওয়ার উপযোগী মুখ ও স্বরযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হতে পারে না। অবশ্য শিশুবিভাগের সাত বছরের কম বয়সী ছেলেদের বেলাতেই এগুলির তাৎপর্য্য সব চেয়ে বেশী। কিন্তু তাদের শিক্ষায় এখনও এদিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় না। তাই আমরা অনেক সময়ে খুব ছোট বয়স থেকেই শিশুকে লেখা, ছবি আঁকা ও সেলাই নিভু‍র্ল করতে শেখাতে যাই। তাদের চোখ ও হাতের অতি সূক্ষ্ম ক্রিয়ার উপর আমরা অতিরিক্ত জোর দিই, অথচ যেরূপ সহজ ও বলিষ্ঠভাবে শারীরিক অঙ্গচালনা ক'রে তাদের বড় বয়সের ক্রিয়াদক্ষতার দৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠবে, তার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় না। সুখের বিষয় আজকাল এই বিষয়ে তাদের শিক্ষাপদ্ধতির স্থিরভাবে উন্নতি হচ্ছে। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষাবয়সের শিশুদের পক্ষেও এই সব শারীরিক পরিবর্ত্তনের গুরুত্ব যথেষ্ট, তা উপরে বলা হয়েছে। আগেকার তুলনায় অবশ্য এই সময়ে সূক্ষ্ম ও নিভু‍র্ল ক্রিয়ার উপর অধিক জোর দেওয়া যায়; কিন্তু এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ না ক'রে ক্রমে ক্রমে করতে হবে এবং এ বিষয়ে খুব বেশী জোর দেওয়াও এই বয়সে চলবে না। ছোট ছোট ক্রিয়াগুলি ত্রুটিহীন করবার চেষ্টা না করে, শিশুকে স্বাভাবিক ও অবাধ শরীরচালনা প্রচুর পরিমাণে করতে দিলে তার বিকাশ আরও সুন্দর ও সম্পূর্ণ হয়।

আমরা কখনও কখনও শিশুদের খুব ছোট লেখা পড়তে দিই। মনে রাখা দরকার যে আট থেকে এগার বছর বয়স পর্য্যন্ত অক্ষরের

আকার মোটামুটি এক ইঞ্চির দ্বাদশাংশ হওয়া চাই। তা ছাড়া ছোট শিশুদের অতি সূক্ষ্ম পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতে বা খুব সরু সূঁচ সুতো দিয়ে সেলাই করতেও দেওয়া হয়। তার উপর আবার শিশুকে এই কাজগুলি এতটা নিভুর্লভাবে করতে হয়, যা তার বয়সের তুলনায় অধিক। এর ফলে তার চোখের দোষ হয়, মেজাজ খারাপ হয়, মানসিক সাম্য নষ্ট হয়। জোর ক'রে, ভয়ে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে বা আমাদের খুসী করবার জন্য সেগুলি সে করে, কিন্তু এজন্য তাকেই ভুগতে হয়। সাত বছরের উর্দ্ধ বয়সের ছেলেমেয়েদের কঠিন চক্ষুরোগের পরিমাণ বেড়েই চলেছে দেখা যায়, তা এরই ফল। এর অপর কুফল স্নায়বিক অবসাদ এবং মানসিক শক্তির ক্ষয়, এই দোষগুলি স্পষ্ট নজরে না পড়লেও এগুলির গুরুত্ব কম নয়।

সুতরাং নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের দৈহিক চাঞ্চল্যে বাধা না দিয়ে, তা কাজে লাগানই আমাদের কর্ত্তব্য। এখনকার দিনে শারীরিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে শেখাবার ও নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য অনেক ভাল বন্দোবস্ত হয়েছে ; ড্রিল, ক্রীড়া, দৈহিক ভঙ্গীর অনুশীলন, স্বল্প বিরামের সময়ে শিশুদের নিজেদের খেলা, এ সবের মধ্যে এগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা আরও বাড়াতে হবে। খোলা বাতাসে অঙ্গচালনা ও ব্যায়ামের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় যদি আরও বেশী করা যায়, তবে তা শিশুদের সঙ্গে তাদের শিক্ষকদেরও স্বাস্থ্য ও সুখের বিশেষ অনুকূল হবে। বিশুদ্ধ বায়ু ও ব্যায়ামের অভাব হেতু রোগ সাত থেকে এগার বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।

কিন্তু কেবল মাথার কাজের ফাঁকে একটু একটু সময় শারীরিক ক্রিয়া যোগ ক'রে দিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। মানসিক ক্রিয়ার মধ্যেও হাত ও দেহের চালনা থাকলে তা সব চেয়ে ফলপ্রসূ

হবে। এই বয়সে শিশুর বুদ্ধির ব্যবহারও প্রধানতঃ ক্রিয়ামূলক। চিন্তা করার সময়ে তাকে হাত ও জিভ ব্যবহার করতে হয়, মনে মনে ভাবার চেয়ে মুখে কথা ব'লে চিন্তা করতে সে ভাল পারে।

এগুলি থেকে আমাদের বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। অনেকেই এখন জানেন যে, "ছন্দমত কোনও হাতের কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিশুর শিক্ষা দেওয়াই এই পদ্ধতির মূলনীতি; মহাত্মা গান্ধী সে সম্পর্কে বলেছেন, "শিশু যে হাতের কাজটি শিখছে, তার মাধ্যমে তার শরীর মন ও আত্মার সমগ্র শিক্ষা দেওয়াই হ'ল প্রধান উদ্দেশ্য।" শিশু যখন ঠিকভাবে পরিচালিত শারীরিক ক্রিয়া ও ভঙ্গীর সাহায্যে শেখে, তার সে শিক্ষা মৌখিক ও পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে অনেক ভাল ও স্বাভাবিক হয়।

শিশুর সমগ্র শিক্ষার ব্যবস্থা তার ক্রিয়ার সঙ্গে তাল রেখে হওয়া আবশ্যক। অঙ্গচালনার আগ্রহ তার নিজেকে প্রকাশ করবার এবং সব জিনিষ বোঝবার আগ্রহেরই অংশ। শিশুর দৌড়ান, লাফান ও খেলা করার সঙ্গে, নানা ভঙ্গী ও ছন্দ, সঙ্গীত ও নৃত্য, নকল করা ও জিনিস গড়ার প্রতিও সমান আগ্রহ দেখা যায়। এই থেকে বোঝা যায় তার ক্রিয়ার প্রেরণা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষার সহায়ক। খেলা-ধূলা ও ড্রিলের সঙ্গে তাদের শিল্প ও হাতের কাজ অনুশীলনেরও প্রচুর সুযোগ দিয়ে তাদের ক্রিয়ার প্রয়োজন মেটাতে হবে।

শারীরিক ক্রিয়ার প্রতি শিশুর যে ঝোঁক আছে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সকল সুযোগ তবু এখানেই শেষ হল না। শিশুর নিজ দৈহিক ক্রিয়ার যে সৃষ্টিগত মূল্য আছে, তাকেই কেন্দ্র ক'রে শ্রেণীর এবং সমগ্র বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অধ্যাপনাপ্রণালীর মত শ্রেণীর আসবাব ও সাজসজ্জাও এ সম্পর্কে সহায়তা বা বাধার কারণ হতে

হাতের কাজ

নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীর পড়া
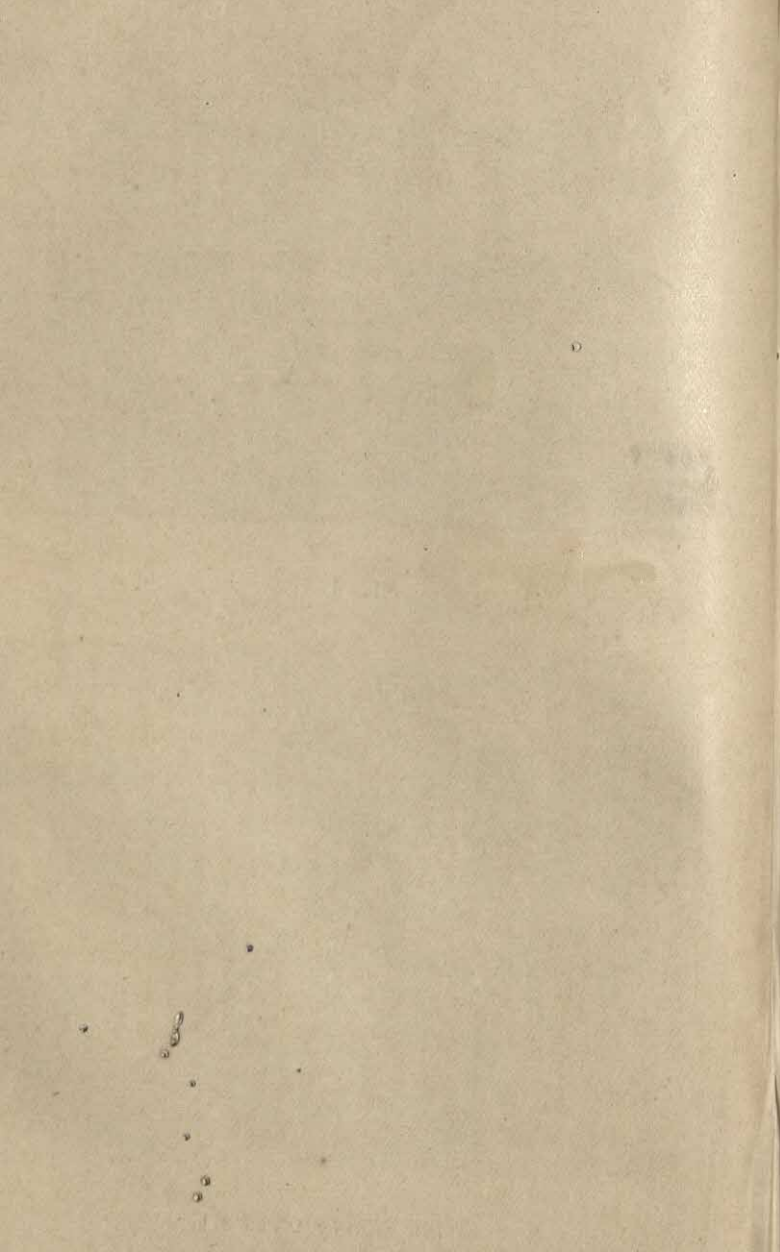
পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকাণ্ড আকারের ভারী বেঞ্চ, ডেস্ক ও টেবিলের স্থান নেই। ছোট হাল্কা টেবিল চেয়ার যা সহজে নাড়া যায়, এমন সব জিনিষপত্র যা শিশুরা নিজেরাই সাজিয়ে রাখতে ও নিতে পারে, এই রকম সব ব্যবস্থা চাই। আমাদের দেশের গরম আবহাওয়ায় মেঝেতে বসাই স্বাভাবিক ও আরামপ্রদ; সুতরাং এ দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটিতে আসন ও তার সঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী ডেস্কের বন্দোবস্তই ঠিক হবে। এই রকম ব্যবস্থার সঙ্গে শ্রেণীর শৃঙ্খলা ও পরিচালনা যদি ছেলেদের খেলা ও কর্ম্মবিভাগ অনুযায়ী হয়, তবে তা দেহগঠনের সঙ্গে সামাজিক শিক্ষারও পরিপোষক হবে।

এর পরে আমরা শিশুর সামাজিক বিকাশের প্রধান তথ্যগুলি আলোচনা করব; আর তা থেকে শিশুর স্থিরতার পরিবর্ত্তে চঞ্চলতাই যে বিদ্যালয়ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া উচিত, এই যুক্তির কতদূর সমর্থন মেলে, তাও দেখা যাবে।

২। ছোট শিশুর সামাজিক জীবন

সাত বছরের কম এবং এগার বছরের বেশী বয়সের শিশুদের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য দেখা যায় তাদের সামাজিক আচরণে। যেমন প্রথম অল্পবয়সী শিশু মা বাপ বা শিক্ষককে ঘনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধ'রে থাকে, নিজের অধিকাংশ মনোভাব তাঁদের কাছে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে। তারই এগার বছর বয়সের ভাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া সবে সাঙ্গ করেছে, কিন্তু সে বড়দের উপর ঢের কম নির্ভরশীল, আর তাঁদের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করার আগ্রহ তার অনেক কম।

এই পরিবর্ত্তন যে শুধু কৌতূহলোদ্দীপক, তাই নয়, বিভিন্ন বয়সের

নিজেদের খেলায়, যেমন বিদ্যালয়ের বিরামের সময়ে তাদের ব্যবহার যতটা স্বাভাবিক ও সহজ স্বাধীনভাবে থাকে, শ্রেণীতে শিক্ষকের সামনে বা বাড়ীতে, যখন তারা জানে যে অভিভাবকের দৃষ্টি তাদের উপরে আছে, সে সময়ে সেরকমটি হতে পারে না। এই রকম অবস্থায় অর্থাৎ যখন তারা বড়দের দৃষ্টির বাইরে থাকে, তখনই তাদের অন্তরের আসল রূপটি সরল ও স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ পায় এবং স্কুলে ও বিদ্যালয়ে তাদের আচরণের উপর থেকে নূতন আলোকপাত হয়।

প্রথম লক্ষ্য করবার মত জিনিস হ'ল এই যে সকল বয়সেই শিশুর সামাজিক ভাব ও বুদ্ধির বিকাশ খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তবে একথা বলা যায় না যে একটি অপরটির উপরে নির্ভরশীল। এমন যুক্তি অবশ্য দেওয়া যায় যে, শিশুর আচরণ কি ধরণের হবে, তা যে কোনও বয়সেই তার বোধশক্তির বিকাশ অনুসারেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, এই কথা বললে খুব ভুল হয় না যে, খুব ছোট বয়সের শিশুর ব্যবহার শুধু তার নিজস্ব ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি দ্বারাই প্রভাবিত হয়; এর মধ্যে নৈতিক আদর্শের স্থান নেই, কারণ তার মন ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম নয়। তার কাছে 'অন্যায়' কথাটির অর্থ যে 'বড়রা যাতে রাগ করেন।' পরে কৈশোরে যখন সে স্পষ্ট ধারণার সাহায্যে চিন্তা করতে পারে, তখনই এইরূপ নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) আদর্শ, অর্থাৎ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু ধারণাত্মক আদর্শের প্রভাব তার মধ্যে আসতে পারে। জড়বুদ্ধি শিশুর কখনও স্পষ্ট চিন্তা করবার মত বুদ্ধির বিকাশ হয় না, সুতরাং সে আজীবন শুধু তার সহজ সুখ ও দুঃখের ধারণা দ্বারাই চালিত হয়।

তা হ'লেও কিন্তু বুদ্ধির অভিব্যক্তির সাথেই যে সামাজিক বোধ আসে সে কথা কিছুতেই বলা চলে না। এমন কি শিশুমনোবিদ্যার একজন

শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ, জেনেভা সহরের অধ্যাপক জ়ঁা পিয়াজে (Jean Piaget) এত দূর পর্য্যন্ত বলেছেন যে আসল ঘটনা এর ঠিক বিপরীত। তিনি বলেন যে সামাজিক বোধের প্রেরণাই বুদ্ধির ক্রমোন্নতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি বলেন যে, শিশুর সাত আট বছর বয়সে অপরের মতামত সম্বন্ধে সচেতনতা আর তারই সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক (self-centred) ভাবটিও কমে যায় বলেই তার জগতের সঙ্গে সোজাসুজি দেখা ও ছোঁয়ার পরিচয় থেকে ক্রমে সূক্ষ্ম ধারণার সূচনা হয়; তখন চিন্তা কি, সে কথাও তার মনে আসে, আর এই ভাবে সে নিজের চিন্তা সুশৃঙ্খল করতে শেখে।

ভাল করে বিবেচনা করে দেখলে মনে হয় যে, এই দুই বিপরীত সিদ্ধান্তের, অর্থাৎ একদিকে বুদ্ধি থেকে শিশুর সামাজিক পরিণতি ঘটে, আর অপর দিকে সামাজিকতা বুদ্ধির উৎকর্ষ বিধান করে, এই দুটির কোনটিই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত বা হিতকর হবে না। শিশুর বুদ্ধি ও সামাজিক ভাবের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্পর্ক দেখবার চেষ্টা না করে, সারা শৈশবে তার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য সমন্বিত যে বিকাশ চলতে থাকে, সেটিকে একটা সম্পূর্ণ ব্যাপার হিসাবে দেখাই ভাল। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনটি অন্য পরিবর্ত্তনগুলির সঙ্গে জড়িত আছে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা শিশুর ক্রমপরিণতির কখনও একটি দিক, কখনও আর এক দিক বেছে নিই বটে; কিন্তু আসলে এগুলি পৃথক নয়, আর একথাও আমরা বলতে পারি না যে, এর একটির অন্য সব গুলির উপরে প্রাধান্য রয়েছে। আমাদের ভাবতে হবে সম্পূর্ণ শিশু ও তার সকল ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যের কথা, সমগ্র শৈশব ধরে সে সারাক্ষণ কি ভাবে খেলে ও হাসে, ঝগড়া করে ও ভালবাসে, চিন্তা ও প্রশ্ন করে, তারই কথা। সুতরাং এখানে আলোচনাক্রমে যদি আমরা এক জায়গায়

বলি, যে শিশুর সামাজিক জীবনে বোধশক্তির গুরুত্ব আছে, আবার আর এক স্থানে বলা হয় যে, সামাজিক মেলামেশা শিশুর চিন্তায় মূল্যবান প্রেরণা দেয়, তাহ'লে এমন মনে করবার দরকার নেই যে, একটিকে অপরটির কারণ বলা হচ্ছে। পাঠক মনে রাখবেন যে, চিন্তা ও বাহ্য আচরণের পরস্পর প্রভাবের ব্যাপারটি দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য।

শিশুবিভাগে শিক্ষার শেষ ভাগে, ছয় সাত বছর বয়সে, শিশুর সামাজিক আচরণের স্থূল বৈশিষ্ট্যগুলি এখন দেখা যাক। তাই থেকে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার পর্য্যায়ে এগুলির কিরূপ পরিণতি ঘটতে থাকে, সে কথা বোঝা যাবে।

শিশুশ্রেণীতে অধ্যাপনারত শিক্ষকমাত্রেই জানেন যে, সাত বছরের কম বয়সের শিশুদের উপর বড়দের হাসি বা ভ্রূকুটির প্রভাব খুব বেশী। শিশুর দলটি যে বয়স্ক ব্যক্তির অধীনে থাকে, তাঁর সম্মতি বা অসম্মতি এই রকম ছোট শিশুর পক্ষে অন্য সঙ্গীদের ইচ্ছা বা মতামত অপেক্ষা মোটের উপর অনেক বেশী মূল্যবান। শিশুশ্রেণীর ছোট ছেলেরা পৃথকভাবেই শিক্ষকের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ বা বিরুদ্ধ ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য একের ব্যবহারের প্রভাব খানিকটা অন্যদের উপরে পড়ে বটে; কখনও আমরা এমনও দেখি যে একটা চঞ্চলতা বা হাসির ঢেউ সারা শ্রেণীর মধ্যে চলেছে। কিন্তু দশ এগার বছরের ছেলেরা যেমন দলবদ্ধ হয়ে স্থির ও দৃঢ়ভাবে শিক্ষকের বিরুদ্ধতা করতে পারে, এরূপ ছোট শিশুদের মধ্যে সে ঘটনা অতি বিরল। আর তাদের কর্ম্ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে একটা সত্যিকার ও স্থায়ী সঙ্ঘবদ্ধ ভাবও গড়ে তোলা সহজ নয়। শিক্ষকের প্রত্যেক শিশুর সঙ্গে প্রায়ই পৃথক ও প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থাকে। বুদ্ধিমান শিক্ষক অবশ্য ছয় সাত বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও, খেলা-ধুলা, নৃত্যগীত, সমবেত হাতের কাজ, ইত্যাদির মাধ্যমে সহযোগিতার

ভাব জাগিয়ে তুলতে পারেন, কিন্তু সেটিকে স্থায়ীভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাঁকে ক্রমাগত প্রেরণা এবং সক্রিয়ভাবে উপদেশ দিয়ে যেতে হবে। এইভাবে সাতের নীচের বয়সের শিশুদের ভয় ও ভালবাসা প্রধানতঃ বড়দের, অর্থাৎ মা বাপের অথবা যাঁরা মাতাপিতার কাজটি করছেন, তাঁদেরই ঘিরে থাকে।

বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে অথবা বাড়ীতে একসঙ্গে খেলতে গিয়ে এই সব ছোট শিশুরা নানা রকম খেলার জন্য নিজেরাই ছোট ছোট দল বাঁধে। কিন্তু এ দল বেশীক্ষণ থাকে না, যে কোনও মুহূর্ত্তে, হয়ত নিজেদের মধ্যে রেষারেষি বা কোনও জিনিষ নিয়ে ঝগড়া হ'ল, অথবা একজনের আর একটি দল হঠাৎ ভাল মনে হওয়ায় সেটিতে যোগ দেবার ইচ্ছা হল, সঙ্গে সঙ্গে দলটি ভেঙে যাবে। দশ বার বছরের ছেলেদের যে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ স্থায়ী দল হয়, এগুলি তা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আসলে মনোবিদ্যার সংজ্ঞায় এগুলি ঠিক দলই নয়, বিশেষ কোনও খেলার উদ্দেশ্যে মিলিত ছেলেদের সাময়িক সমষ্টি মাত্র।

শিশুশ্রেণীর সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত তখনও শিশু পূর্ণ মাত্রায় ব্যক্তিতাবাদী থাকে, অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারে তার নিজের কথা, নিজের ভাল লাগা না লাগাই একমাত্র প্রাধান্য পায়। তার জগৎ তার নিজের অনুভূতির মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকে। অপরের দৃষ্টিভঙ্গী সে বুঝতে পারে না, কারণ নিজের প্রয়োজন আকাঙ্খাই তার কাছে একান্ত গুরুতর। এমন কি অন্যদের সঙ্গে খেলবার সময়েও সে তাদের ইচ্ছা বা ধারণার চেয়ে নিজের চিন্তাতেই বেশী মগ্ন থাকে। এমন ছেলেদের দলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ছেলে তার নিজের উদ্দেশ্যে অন্যগুলিকে লাগাতে চায়। যতক্ষণ তাদের ইচ্ছার মিল হয়, ততক্ষণ সব ঠিক থাকে, কিন্তু যদি একজনের অভিপ্রায় অন্যদের সঙ্গে না মেলে,

তখনই ঝগড়া আরম্ভ হয়। যেমন হয় ত 'পড়া' খেলা হচ্ছে, একজন 'শিক্ষক' হয়ে বসেছে। যতক্ষণ অন্যগুলি তার 'ছাত্র' হয়ে সন্তুষ্ট থাকে, আনন্দে খেলা চলে। কিন্তু ছাত্রদের যদি আর ছোট হয়ে থাকতে ভাল না লাগে ও তারা বলে এবার তাদের শিক্ষক হবার পালা, তবে প্রথম শিক্ষক হয় ত আর খেলতেই চাইবে না। খেলায় একটি মেয়ের 'মা' সাজবার ইচ্ছা হয়েছে, অন্যগুলিও তার 'শিশু' হতে রাজী। সে তাদের দেখাশুনা করছে, সেবা করছে, খাওয়াচ্ছে, শাসনও করছে। যতক্ষণ তারা এই অবস্থায় খুসী থাকে, ততক্ষণ তারা মনের আনন্দে এক সঙ্গে খেলা করে, দলও ঠিক থাকে। কিন্তু যেই একজন শিশুর মায়ের স্থান নেবার সাধ যায়, তা হলেই ঝগড়া ও কান্নার মধ্যে দলটি ভেঙে যায়, কিংবা অন্য খেলা আরম্ভ হয়। পাঁচ বা কাছাকাছি বয়সের শিশুর সম্পর্কে, সে যে ঠিক সহযোগিতার অর্থে অপর শিশুদের সঙ্গে খেলছে, এই কথা না বলে বরং বলা যেতে পারে যে, সে অন্যদের নিয়ে খেলছে, অথবা তার নিজের খেলায় ঘুঁটির মত তাদের ব্যবহার করছে। দলটি প্রত্যেক শিশুর নিজের ক্রিয়া দেখাবার সহায়ক পটভূমি ছাড়া আর কিছু নয়।

সাত বছর বয়সের পক্ষেও এই কথা অনেকাংশে সত্য। সাত বছরের অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে খেলে বটে, কিন্তু দশ বার বছরের ছেলে তার ফুটবলের দলের সঙ্গে এবং দলের হয়ে যেমন খেলা করে এ খেলা তেমন নয়। ছোট ছেলেটি নিজের বাহাদুরী দেখাবার জন্য খেলে, তার দলের সাফল্য বা খ্যাতির জন্য নয়, কিন্তু বড় বয়সে শেষেরটিই হয় তার লক্ষ্য। সাত বছর বয়সে সে অন্যদের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে বা নিজেকে এক বৃহত্তর সমষ্টির অংশরূপে মনে করতে পারে না। তবু পরিবর্তনের লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দেয়। খেলার সময়ে

তারা নিজেরা যে দল গড়ে, তা আগের বয়সের তুলনায় অধিক স্থায়ী ও দৃঢ় হয়; এই থেকেই আসল সঙ্ঘবদ্ধতাবোধের (team-spirit) সূচনা হয়। শ্রেণীতেও দেখা যায় যে, শিশুদের স্থায়ীভাবে একতাবদ্ধ ক'রে রাখা আগেকার চেয়ে একটু সহজ হচ্ছে এবং তারাও কোনও ব্যাপার মধ্যে মধ্যে অপরের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে শিখছে।

৩। শিশুদের শাস্তি সম্বন্ধে ধারণা

ছোট শিশুদের মন তাদের সমবয়সীদের প্রতি না হয়ে তাদের মা বাবা ও শিক্ষকের প্রতি আবদ্ধ থাকার ফলে, এই বয়সে তাদের সামাজিক জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সাত বছরের কম বয়সী শিশুরা কাল্পনিক ভূমিকায় মন-গড়া (make-believe) খেলা ভালবাসে, তাতে তারা খুসীমত কোনও পরিচিত ভূমিকা নেয়। তাদের এই খেলা লক্ষ্য করলে, যদি মন দিয়ে শোনা যায় যে খেলার পিতামাতা তাঁদের 'শিশু'দের কি বলছেন, কিংবা 'নেতা' তাঁর 'অনুচর'দের, রেলের গার্ড 'যাত্রী'দের, অর্থাৎ যে কোনও শক্তি এবং কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর অধীনস্থ লোকেদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করছেন, তাহলে দেখা যাবে যে, খেলার এই সব 'পদস্থ' ব্যক্তির দাবীগুলি যেমনই নির্ম্মম, তাঁদের শাসন ও সাজার ব্যবস্থাও তেমনই কঠোর। বাস্তবক্ষেত্রে এমন মানুষ যেরূপ করে থাকে বা শিশু কখনও নিজের অভিজ্ঞতায় যা কিছু জেনেছে, সে সবকেই সচরাচর এগুলি ছাড়িয়ে যায়।

এমন হয়ত মনে হতে পারে যে যেখানে দেখা যায় যে, খেলার 'মা' বা 'শিক্ষক' 'শিশু'দের সঙ্গে খুব কঠোর ব্যবহার করছেন, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সেই সব শিশুদের তাদের বাস্তব জীবনেও খুব কড়া

শাসনে থাকতে হয়েছে। কখনও কখনও সত্যই তা দেখা যায় বটে, কিন্তু সকল সময়ে তা নয়। এমনও দেখা যায় যে, খুব উন্নত পরিবারের ছেলেমেয়ে, যাদের মাতাপিতার প্রকৃতি অতি কোমল ও শান্ত, যাদের সাজা পাওয়া দূরের কথা, তিরস্কারই প্রায় কখনও হয়নি, এমন শিশুরাও তাদের খেলার 'পোষ্য' ও 'ছাত্র'দের প্রতি বড়ই নির্ম্মম ব্যবহার করে। একটি বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যাক। এক পাঁচ বছরের ছেলে, সে যে বাড়ীতে মানুষ হয়েছে, সেখানে শিশুপালনে 'দুষ্ট' বা ঐ শ্রেণীর কোনও শব্দ ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না, আর ভৎসনা ও শাস্তি ত নিষিদ্ধ বটেই। ছেলেটি একদিন তারই মত শান্ত পরিবেশে পালিত সঙ্গীদের সঙ্গে আপন মনে খেলছিল। তাকে লক্ষ্য করে দেখা গেল যে, সে সাথীদের সঙ্গে মিলে তখনকার খেলার 'শিশু'দের প্রতি খুব তেজের সঙ্গে 'দুষ্ট' ইত্যাদি কথা বলছে। তার সঙ্গীদের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখা গেল ; মেয়েটির মায়ের প্রকৃতি খুব সহনশীল এবং বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে সে খুব সহজ শাসনের মধ্যে থাকে। সে একবার খেলার কোনও শিশুকে নিয়ে খুব জোরে ঝাঁকানি দিচ্ছে আর অতি রুক্ষস্বরে বলছে, "দুষ্ট ছেলে, বেয়াড়া খারাপ ছেলে!" এই মেয়েটির বয়স যখন সাত বছর হ'ল, সে তখন তার খেলার পুতুল ছেলেমেয়েদের একটির সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এইরূপ বলত, "মায়া এক বিশ্রী জানোয়ার হয়েছে, তাকে আমি কষে চাবুক লাগাব!"

এইরূপ অল্প বয়সের যে সব শিশুদের আমরা মাঠে, বাগানে, পথে, সর্ব্বত্র নিজেদের দলবেঁধে খেলতে দেখি, তারা যে ভাবেই পালিত হোক না কেন, সকলেরই এই ধরণের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। শিশুদের স্বভাবের বিভিন্নতা অনুসারে এর ছোটখাট তারতম্য হতে পারে, কিন্তু এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এক্ষেত্রে শিশুর খেলার সময়ের

আচরণের সঙ্গে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্পর্ক খুব সামান্যই থাকে। শিশুর পরিণতির এই পর্য্যায়টিতে তার মনের মধ্যে যেরূপ ক্রিয়া চলতে থাকে, এই আচরণে তারই অভিব্যক্তি দেখা যায়।

অন্য শিশুদের সহিত সম্পর্কেও ছোট শিশুরা প্রায়ই বড়দের তুলনায় ঢের বেশী কঠোর হয়। ছয় সাত বছরের শিশুরা তাদের সমবয়সীদের ব্যবহার বা কার্য্য বিচার করবার সময়ে, বিশেষতঃ যারা তাদের চেয়ে একটু ছোট বা দুর্ব্বল, তাদের বেলায়, তারা মাতাপিতা বা শিক্ষকের চেয়ে অনেক বেশী নির্ম্মম হয়। তারা যখন অবাধে পরস্পর সম্বন্ধে মন্তব্য করে, তখন এই সব ধরণের কথা শোনা যায় "কমলার আঁকা ছবি বিশ্রী" "রবিকে আমাদের ভাল লাগে না, সে ভয়ানক চেঁচায়" "শীলা বড় খারাপ ঝগড়াটে মেয়ে, তার সঙ্গে আমরা খেলব না।" কোন শিশু পড়ে গিয়ে কেঁদে ফেললে আর সবাই তার সেই দুর্ব্বলতাকে বিদ্রূপ করে বলে, "কচি ছেলে।" এর অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। অনেক সময়ে তারা ছোট ও দুর্ব্বল সঙ্গীদের স্নেহ করে ও রক্ষা করে; কিন্তু যাদের বয়স বা দক্ষতা কম, তাদের সমালোচনা করবার সময়ে তারা বড়দের চেয়ে ঢের বেশী নির্দ্দয় হয়ে থাকে। তাদের বিচারে ছাড় বা বিবেচনা নেই, মাত্রাজ্ঞানও নেই, তারা হয় সম্পূর্ণ প্রশংসা, নয় সম্পূর্ণই নিন্দা করবে। শিশুগুলির ভার যে বয়স্ক ব্যক্তির হাতে, মাত্রা বজায় রাখার কাজটি তাঁকেই করতে হয়; তিনি শক্তিহীন শিশুদের উৎসাহ দেন, আর ভাল ছেলেরা যাতে সংযতভাবে অন্যদের সমালোচনা করতে পারে, সে শিক্ষাও তাদের দেবার চেষ্টা করেন।

বাড়ীতেও ছয় থেকে আট বছরের ছেলে মেয়ে প্রায়ই ছোট ভাই বোনের ক্রিয়াকলাপ যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ছোটরা কি খেলনা

নিয়ে খেলবে, খেলনা কিরূপে ব্যবহার করবে, কোথায় তুলে রাখবে, এসব বিষয়ে খুব কঠোর মাতা পিতার মত তারা হুকুম চালায়। সুযোগ পেলেই এই বয়সের শিশুরা খেলার মধ্যে অন্যদের মা বাপ বা শিক্ষক সাজতে ভালবাসে। তাদের মানসিক জীবনে এবং তার বাহ্য অভিব্যক্তিতে পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কটিই ফুটে বেরোয়, ভাই বোন সহচরের সম্পর্ক নয়। পরে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় ; প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উঠে আবার তারাই কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সময়ে অন্য শিশুগুলিকে নিজেদের সহায় মনে করে, তা পরে দেখা যাবে।

এখন এই প্রশ্ন উঠে যে, শিশু অন্য শিশুদের কাজের এমন কঠোর সমালোচনা ও নির্ম্মম বিচার করে কেন? তার কারণ হল এই যে, অপরদের 'ছেলেমানুষী', কান্না, অক্ষমতা, অসংযমের প্রতি এরূপ অসহিষ্ণুতা দেখিয়ে সে আসলে নিজেরই এই ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলছে। যেমন বয়স্ক লোকও নিজের মধ্যে যে দোষটির সঙ্গে লড়ে, অপরের সেই দোষের বেশী নিন্দা করে, ছোটদের বেলায়ও ঠিক তাই। যখন তারা নিজেদের ক্রোধ ও ভয় সংযত করতে শেখে, তাদের নিজেদের ক্রিয়ায় দক্ষতা আসে, তখনই তারা অপরের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সহনশীল ও ক্ষমানিষ্ঠ হতে পারে।

শিশু মনোবিদ্যায় অধ্যাপক পিয়াজের মহামূল্য দানের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হয়েছে। তিনি শিশুর সামাজিক বিকাশ সম্পর্ক গবেষণা করে ছোট বয়সের শিশুদের মনোভাবে কতকগুলি অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন ; উপরে যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে এগুলি মেলে। তিনি বিভিন্ন বয়সের শিশুদের গুলি খেলা এবং এরূপ অন্যান্য ক্রীড়া লক্ষ্য করেছেন, আর শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে, খেলার নিয়ম সম্বন্ধে তার ধারণার কিরূপ পর পর পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকে, তাই আবিষ্কার করবার

চেষ্টা করেছেন। শিশুদের কতকগুলি কাহিনী ও ঘটনা শুনিয়ে সেগুলির উপরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাদের মনে ন্যায়নিষ্ঠার ভাব কিভাবে বিকাশলাভ করে, সে বিষয়েও তিনি অনুসন্ধান করে দেখেছেন।

সুন্দর কতকগুলি পরীক্ষায় তিনি একের পর এক বালকের সঙ্গে গুলি খেলেন, আর খেলার বিধি বলতে সে কি বোঝে, কথায় কথায় তিনি ছেলেটির কাছ থেকে তা শোনেন। তারপর খেলতে খেলতে একটি নিয়ম ভঙ্গ করে তিনি লক্ষ্য করেন যে, এতে বালকের মনোভাব কিরূপ হয়। এই পরীক্ষা থেকে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে, এ বিষয়ে সাত আট বছরের কম বয়সী শিশুদের ধারণা অনেকাংশেই দশ বারো বছরের শিশু হতে ভিন্নরূপ।

সাত আট বছর বয়স হবার আগে শিশুরা খেলার নিয়মগুলিকে চরম বিধান মনে করে। বড়রা যা বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা যেমন বোঝে যে খেলোয়াড়দের সম্মতি অনুসারেই এমন কয়েকটি রীতি বেঁধে নেওয়া হয়েছে, ছোটগুলি তা বোঝে না। তাদের ধারণা যেন এগুলি অনাদি যুগ থেকে চলে আসছে, যদি কখনও এর সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে পুরাকালে ভগবান বা কোনও মহামানবই এগুলির সৃষ্টি করে গেছেন। এগুলির বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করা চলে না, ধর্ম্মের নিয়মের মতই এগুলি মানতে হবে। সত্যই অল্পবয়সী শিশুর চোখে খেলার নিয়ম ও নৈতিক বিধির মধ্যে প্রভেদ নেই। খেলার নিয়ম তাদের কাছে অলঙ্ঘনীয়, অমোঘ বিধান ; এর অমান্য করলে তার দণ্ডও বড়ই কঠিন হবে। আর কোনও অবস্থায়ই সে নিয়মের পরিবর্ত্তন করাও চলবে না। দশ এগার বছর বয়সে এই মনোভাবের বদল হয়। তখন নিয়মগুলির এই সর্ব্বশক্তিমান ও অটল প্রভাব চলে যেতে থাকে, আর বাধ্যতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতার নীতি এসে পড়ে। এই বয়সে শিশুরা খেলার

নিয়মকে খেলোয়াড়দের মধ্যে পরস্পর চুক্তিরূপে গণ্য করে। নিয়মগুলি ঠিকমত মেনে চলার উপরে তারা জোর দেয় বটে, কিন্তু খেলার আগে যদি সকলের সম্মতি থাকে, তবে এগুলির বদল করাও চলে।

মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি অন্যায়ের উপযুক্ত দণ্ড সম্বন্ধে শিশুদের ধারণা কি, সে সম্বন্ধেও মনোবিৎ পিয়াজে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি প্রত্যেক শিশুকে এক বালকের গল্প বললেন, সে তার মায়ের কাছে মিথ্যা বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কয়েকটি সাজারও উল্লেখ করলেন, মৃদু যুক্তিযুক্ত শাস্তি থেকে আরম্ভ করে অতি কঠোর নানাবিধ শাস্তি। তিনি দেখতে পেলেন যে সবক্ষেত্রেই ছোট ছেলেগুলি কঠিন সাজাই উপযুক্ত বিবেচনা করছে, তাদের মাত্রাজ্ঞান বা সহনশীলতা নেই বললেই চলে। বড় ছেলেদের বেলায় কিন্তু লক্ষ্য করা গেল যে তাদের বিচারে ক্ষুদ্র শাস্তিই অধিক ন্যায়সঙ্গত হয়। পিয়াজে আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করলেন এই যে, খেলার নিয়মের মত, এগার বার বছর বয়সে ছেলেদের নৈতিক ধারণাও পরিবর্ত্তিত হয়ে, কম বয়সের কর্ত্তৃত্ব ও বাধ্যতার স্থলে বোধশক্তি ও পরস্পর শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আগেকার নীরব আজ্ঞাবাহিতার স্থানে এখন সহযোগিতার মনোভাব দেখা দেয়।

এই সব পরীক্ষা ও গবেষণার ফলের সঙ্গে, মনঃ সমীক্ষার (psycho analysis) পদ্ধতিতে শিশুমনের গভীর প্রদেশ অর্থাৎ নিজ্ঞান মন সম্বন্ধে যে সকল তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তারও সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। শিশুর কল্পনায় তার দুষ্টামী বা এমন কি দুষ্কর্ম্মের চিন্তার পর্য্যন্ত অতি ভয়ানক শাস্তির ভয় থাকে। বিচার কিরূপ হবে, বাবা মা কি বলবেন, এ সব বিষয়ে তাদের ধারণা নিজেদের অসংযত আকাঙ্ক্ষা, ভয়, ক্রোধের মাপেই গড়ে উঠে, সুতরাং তারও মাত্রা থাকে না। বাস্তব ঘটনার অভিজ্ঞতা

তাদের খুব অল্প ও সীমাবদ্ধ বলে, তার দ্বারা তারা নিজেদের কল্পনার সত্যতা বিচার করে দেখতে পারে না।

বড় ছেলেদের মনে খেলার নিয়ম ভঙ্গ হবার ভয় অপেক্ষাকৃত কম হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারাই কিন্তু নিয়মগুলি বেশী পালন করতে পারে। ছোট ছেলেগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তন বা লঙ্ঘনের কথা ভাবতেই রাজী নয়, উপরে বর্ণিত অধ্যাপক পিয়াজের পরীক্ষায় তা দেখা গেছে, কিন্তু আসলে তারাই খেলার বিধি অমান্য করে ঢের বেশী। পিয়াজে দেখেছেন যে অল্পবয়সের শিশু, খেলায় ঠকান মহাপাপ, এই ধারণা থাকা সত্ত্বেও, ঠকাতে ছাড়ে না। শুধু তাই নয়; এইভাবে খেলা জিতে, সত্যই তার জিত হয়েছে, এই বিশ্বাস করে সে নিজেকেও প্রবঞ্চিত করে। কিন্তু দশ বার বছরের ছেলের ধারণা এর চেয়ে অনেক বাস্তবধর্ম্মী। খেলায় ঠকালে যে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে, এমন কোনও কল্পনা তার নেই, অথচ প্রতারণার লোভও আবার সে ঢের সহজে জয় করতে পারে। এই বড় বয়সের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই মনে করে যে জুয়াচুরি করে বা নিয়ম ভঙ্গ করে খেলা জিতলে, তা জিতই নয়।

এইটিই হল ছোট শিশুদের থেকে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাত বছরের বেশী বয়সের শিশুদের এক বৃহৎ প্রভেদ। ছোটগুলির তুলনায় তাদের নৈতিক ও সামাজিক বিচারবুদ্ধি অনেক সংযত ও যুক্তিসঙ্গত হয়, অথচ বাস্তবক্ষেত্রে এগুলি আবার তাদের বেলায়ই অধিকতর কার্য্যকরী এবং নির্ভরযোগ্য দেখা যায়।

৪। ভালবাসা ও ঘৃণা

সাত বছরের নিম্নবয়স্ক শিশুদের অহমিকা বা আত্মকেন্দ্রিক ভাবের আলোচনাকালে আমরা বলেছি যে তারা অনেক সময়ে কাল্পনিক মন-

গড়া খেলা খেলবার জন্য নিজে থেকেই নিজেদের মধ্যে দল গড়ে নেয়। আর একথাও বলা হয়েছে যে এ সব দল বড়ই অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। এখন এর কারণগুলি আরও ভাল করে অনুসন্ধান করা যাক ; কারণ, তা পরবর্ত্তী বয়সের পরিণতির বিশেষ ধারাটির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করবে।

সময়ে সময়ে লোককে এমন কথা বলতে শোনা যায় যে, শিশু যে ব্যক্তিতাবাদী, অর্থাৎ নিজের চিন্তাতেই তন্ময়, এর কারণ তার কোনও অভাব এখনও রয়েছে ; যেমন হয় ত বলা হয় যে তার "সামাজিক প্রবৃত্তির" বিকাশ এখনও আরম্ভ হয় নি। কিন্তু যত্নসহকারে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় শিশুর যে কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রবৃত্তির অভাব রয়েছে, ও তার উন্মেষ পরে হবে, সে কথা সত্য নয়। বরং এই কথাই সত্য যে, প্রথমে পরস্পরের প্রতি শিশুগণের যে মনোভাব থাকে, বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে তার প্রকাশভঙ্গীতে কতকগুলি পরিবর্ত্তন হয়। শিশুর বৃদ্ধির সারা বয়সটিই এসকল পরিবর্ত্তন অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে, তবে শেষের রূপটি প্রথম থেকে একেবারে বিভিন্ন মনে হতে পারে।

সাত বছরের কম বয়সী শিশুদের দলগত একতা যে ক্ষণস্থায়ী, তার কারণ যে তাদের পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাব কম, তা নয়, বরং এর অর্থ এই যে তাদের ভিতরে শত্রুতার ভাবও তেমনই প্রবল। শিশুদের স্নেহ ও প্রশংসা খুবই প্রচুর ও উদার হতে পারে, কিন্তু তাদের হিংসা ও রেষা-রেষির মাত্রাও তেমনই বেশী ও প্রবল হয়। সেজন্য তারা যেমন পরস্পরের পরম অনুগত বন্ধু হয়, তেমনই নিমেষের মধ্যে ও সামান্যমাত্র কারণে অতি নির্ম্মম শত্রু হয়ে উঠতে পারে। এটিই হল তাদের সামাজিক সম্পর্কের আসল অন্তরায়। তাদের ভালবাসা ও ঘৃণার মধ্যে

সমান সরলতা আছে, তাই মুহূর্ত্তের মধ্যে স্নেহ থেকে ক্রোধ, সহযোগিতা থেকে বিবাদ ও কান্নাকাটি এসে যেতে পারে। প্রীতিপূর্ণ সখ্য ও স্থায়ী আনুগত্যের অনুকূলে মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা এই বয়সে হয় না।

এই বয়সের শিশুরা যখন নিজের মনে অবাধে খেলা করে, বা শ্রেণীকক্ষে, বারান্দায় যখন স্বাধীনভাবে পরস্পরের সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করে, তা থেকে দেখা যায় যে, তাদের এই বন্ধুত্ব ও শত্রুতার অহর্নিশি দ্বন্দ্বের এক সহজ নিষ্পত্তির উপায় তারা আপনা হতেই করে নেয়। এক দলের অন্তর্গত বন্ধুদের শত্রুতা গিয়ে পড়ে অন্য দলের ছেলের উপর। বিরাগ দেখাবার জন্য তারা শত্রু খুঁজে নেয়, তাই সমস্ত অনুরাগ পরিপূর্ণভাবে তাদের বন্ধুদের জন্য সঞ্চিত রাখতে পারে।

শিশুদের সামাজিক আচরণের এই সাবলীলতা ও নাটকীয় স্বচ্ছতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখিকা ডাঃ সুজ়ান আইজ়্যাকস (Dr. Susan Isaacs) আট বছরের কম বয়স্ক একদল শিশুর সমাজগত ক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করেছেন। এরা সকলেই উন্নত পরিবারের সন্তান, তাদের পালন ও শিক্ষা ভালভাবে হয়েছে এবং তাঁরই বিদ্যালয়ে তারা পড়ছে। এই বিদ্যালয়ে শিশুদের কথাবার্ত্তায় সাধারণের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে অবশ্য নির্দ্দয় কাজ করতে দেওয়া হয় না। এবং শিক্ষার ভিতর দিয়ে তারা যাতে পরস্পর সুবিবেচনা ও সহযোগিতা শেখে, সে চেষ্টা সর্ব্বদাই করা হয়। খেলার সময়ে এই শিশুদের আচরণ থেকে তাদের ভালবাসা ও ঘৃণার পরস্পর সম্পর্কটি ঠিকভাবে বোঝা যাবে।

এই শিশুরা প্রায়ই ছোট ছোট দল বেঁধে অপর শিশু বা দল সম্বন্ধে তাদের সাময়িক বিরাগ অতি তেজস্বী ভাষায় ব্যক্ত করে। এইরূপ

তাদের কথাবার্ত্তার নমুনা। "আমরা কি যদুকে বাড়ীর মধ্যে পুঁতে ফেলবো ?" "মধুকে তাড়িয়ে দাও, সে আমাদের সঙ্গে আসবে না।" "আমাদের রেলগাড়ীতে কোনও কয়লা নেই।" একটি শিশু অন্য যে দলের সঙ্গে তখন তার মিল নেই, তার একজনকে উদ্দেশ ক'রে ঘুরে ঘুরে সুর করে বলত, "হতভাগা রাখাল, হতভাগা রাখাল!" কিংবা দুই দলের মধ্যে কথার লড়াই চলত, এক দল আর এক দলকে 'জেলখানায় আটকাবে' ব'লে শাসাত। বড় ছেলেরা দু একটি ছোট ছেলেকে একটি কুটিরে 'জেলে' দেবার চেষ্টাও কয়েকবার সত্যই করেছিল। বিদ্যালয়ে ছবি আঁকা শিক্ষায় শ্রেণী কক্ষের মেঝের বহুল ব্যবহার ছিল। এক সময়ে দেখা গেল, শিশুদের ঝোঁক হয়েছে যে তারা খড়ি দিয়ে মেঝেতে প্রকাণ্ড কুমীর আঁকছে, তার মস্ত হাঁ ও বড় বড় দাঁত ; চিত্রকর ছবি এঁকে তার তখনকার শত্রুকে শাসিয়ে দিচ্ছে যে কুমীর তার 'পা কামড়ে খেয়ে ফেলবে।' কিন্তু এ সব ক্রিয়ার বেশীর ভাগই বেশ ভাল মেজাজে চলত ; সেটি যেন বজায় থাকে, সেদিকে ভারপ্রাপ্ত বয়োজ্যেষ্ঠদের বিশেষ নজর ছিল। তা না হ'লে যদি শিশুদের একেবারে নিজেদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেত, তবে নিঃসন্দেহে তাদের এই দলগত বিবাদ আরও চরম সীমায় পৌছত।

কোনও শিশু একটি দল থেকে বহিষ্কৃত হবার পরে, তার আবার কখনও সেই দলে যোগ দেবার ইচ্ছা হত। যাতে সে দল তাকে ফিরিয়ে নেয়, সে জন্য চেষ্টা করবার একটি অভ্যস্ত রীতি ছিল এই যে, অতি সহজ ও স্পষ্ট কৌশলে অন্য কোনও ছেলের প্রতি দলের বিরক্তি জাগিয়ে দেওয়া, তাহলেই সেখানে আবার নিজের আদর হত! এই কৌশল অবশ্য বড় বয়সের শিশুদের মধ্যে ও বয়স্ক মানুষদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। মনের মধ্যে যে সব হিংসা দ্বেষ

জন্মায়, তা নিজের দলটির বাইরে বার করে দেওয়া, বাইরের লোক বা বিদেশীর উপরে বর্ষণ করাই অতি সহজ পন্থা বলে, বয়স্ক ব্যক্তিরাও তা গ্রহণ করে থাকেন। এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখা যায় এই যে, যুদ্ধের সময়ে স্বদেশবাসী সম্পর্কে যা কিছু হিংসা ও ঘৃণা, সমস্তই জাতির শত্রুর প্রতি চালিত হয় ; দেশপ্রেমের শিখাও তখন অতি উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলে উঠে। শ্রেণীগত বৈষম্য, রাজনৈতিক দলাদলি, জাতিগত বিরোধ এবং খেলার রেষারেষির মধ্যেও একই ব্যাপার দেখতে পাওয়া যাবে।

তা হ'লেও কিন্তু কেবল ছোট শিশুদের মধ্যেই এই অনুরাগ এবং বিরাগের পরস্পর সম্বন্ধে স্পষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপটি নজরে পড়ে। তাদের আনুগত্য ও শত্রুতার প্রেরণা অপরিণত ও অসংযত অবস্থায় থাকে বলে, তাদের সমাজগত আচরণে কৃত্রিমতা আসে না। শিশুর বয়স সাত আট বছর হলে এই সরল আনুগত্য ও বৈরিতার ভাব ধীরে ধীরে আরও স্থায়ী ও শান্ত আকার ধারণ করে। বড়দের জীবনের যে বৈশিষ্ট্যের কথা এখনই উল্লেখ করা গেল, তাই থেকে এর পরবর্ত্তী রূপটি বুঝা যাবে। খুব ছোট বয়সে সঙ্গীদের সঙ্গে যে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল সদ্ভাব ও বিবাদ চলতে থাকে, তা ক্রমশঃ শিশু খানিকটা বড় হলে তাদের কাজ ও খেলার মধ্যে দৃঢ়তর বন্ধুত্ব ও ব্যক্তিগত রেষারেষিতে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র শিশুদের দলগুলির পরস্পর সম্পর্কে আপনা হতেই যে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে তা ক্রমে ক্রমে শ্রেণী, বিদ্যালয় বা সঙ্ঘের অনুমোদিত ও সুগঠিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ নেয়। যাতে এই রেষারেষির ফলে তাদের চেষ্টা দৃঢ়তর হয় এবং কাজ ও খেলার সাফল্যে গর্ব্ব অনুভব করবার মনোভাব আসে, শিক্ষক হিসাবে আমরাও তার সুযোগ গ্রহণ করি।

সুতরাং সাত থেকে এগার বছরের প্রধান পরিবর্তনের ধারা হল এই যে আগেকার ক্ষণস্থায়ী প্রেরণাগুলি ক্রমশঃ সুবিন্যস্ত হতে থাকে। এগুলি ক্রিয়া ও অনুভূতির দৃঢ় অভ্যাসে পরিণত হয়, এবং আরও নির্দ্দিষ্ট ও সার্থক লক্ষ্য অনুযায়ী দলটিকে কেন্দ্র করে থাকে।

ছোটদের রেষারেষিতে যে ভাঙার দিকও রয়েছে, সেটি অগ্রাহ্য করে তার গঠনের দিকটির উপরে গুরুত্ব আরোপ করাই আমাদের রীতি। দলের মধ্যে ছেলেদের প্রতিযোগিতায় যে সুফল হয়, আমরা তার বহুল প্রশংসা করি, কিন্তু বিভিন্ন দলের বিদ্বেষের কথা বিশেষ বলি না। খেলাতেই হোক বা লেখাপড়াতেই হোক, যারা পুরস্কার, পদক জেতে তাদের সুখ্যাতি আমরা করি, তবে যারা হারে তাদের নিন্দা করি না। এই নীতি শিক্ষার পক্ষে বড় ভাল, এতেই ঠিক কাজ হয়। এখানে অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটি বুঝা আমাদের উদ্দেশ্য বলে এর সকল দিকই যথাযথ আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, শিশু ও বালকদের অন্তরঙ্গ সাথীদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র এবং সহযোগিতার বন্ধন অন্য দলের সঙ্গে সুষ্ঠু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। সকল মানুষকে ভালবাসা বড়দের পক্ষেই কঠিন, সুতরাং এতখানি উদার আদর্শ পালন করা শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়।

দলগত রেষারেষির দোষের মধ্যেও বড় গুণ এই যে, একই দলের অন্তর্ভুক্ত ছেলেদের, পরস্পরের প্রতি সহৃদয়তা ও সাহায্যদানের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়। একসঙ্গে কাজ ও খেলা করার অভ্যাসও তাদের হয়। দলের অপর ছেলেদের ইচ্ছা ও ধারণা অন্যরূপ হলেও, বন্ধু বলে শিশুর চোখে তা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা বিপরীত লাগে না, তাই সেগুলি সে মেনে নেয়। এই ভাবে দলের সঙ্গীদের প্রতি বন্ধুতা বশতঃ সে সহজে ত্যাগ স্বীকার করতে এবং তাদের

দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নিতে পারে। যাকে ভালবাসা যায়, তার সঙ্গে দেওয়া ও নেওয়া দুই চলে; যার সম্পর্কে ভয় ও বিরাগ থাকে, তার সঙ্গে তা চলে না।

সুতরাং সাত হতে এগার বছর বয়সের মধ্যে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের প্রতি এই আনুগত্যই ক্রমশঃ, আগেকার আত্মপরায়ণ ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব থেকে কিশোর বয়সের উদার দৃষ্টির সঙ্গে যে যথার্থ সামাজিক বোধ জাগ্রত হয়, সেই অবস্থায় শিশুকে নিয়ে আসে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সব রেষারেষির ঊর্দ্ধে উঠাই শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'লে প্রথমে শিশুদের এমন ক্ষুদ্রতর পরিসরের সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা পাওয়া দরকার, যা তাদের সহানুভূতি ও উপলব্ধির সীমায়ত্ত।

৫। বন্ধু ও নেতা

নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর দিকের শিশুরা সঙ্গীদের যথার্থ সহায় বলে মনে করতে শেখে বলেই, বড়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আর তাদের আগেকার মনখোলা ব্যবহার, বা তাঁদের উপরে অতখানি নির্ভরশীলতা থাকে না। এইটাই হ'ল তাদের এবং ছোট শিশুদের মধ্যে প্রথম বৃহৎ পার্থক্য, কারণ আমরা পূর্ব্বে দেখেছি যে ছোটগুলির তাদের মা বাপ ও শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের মনোভাব থাকে, আর তাঁদের উপরে তারা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

খেলার ও পড়ার সাথীদের সক্রিয় সাহচর্য্যের ফলে এই বয়সে আর দুটি পরিবর্তনও দেখা যায়। প্রথমতঃ, পূর্ব্বেকার মত বড়দের শক্তিমান প্রভাব আর তাদের উপর থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, কম বয়সে

মনে মনে কল্পনার মায়ারাজ্য গড়বার যে প্রবল ঝোঁক থাকে, তা কমে যায়।

সুতরাং সাত থেকে এগার বছরের মধ্যে শিশুর সুখদুঃখ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বয়স্কদের স্থান আগের বয়সের তুলনায় ঢের কম থাকে। শিশু আর আগেকার মত অসহায় দৃষ্টিতে বড়দের হাসি বা ভ্রূকুটীর দিকে তাকিয়ে থাকে না। সে এখন সঙ্গীদের প্রশংসা বা নিন্দা সম্বন্ধেই অনেক বেশী সচেতন। তাদের কথা বলে দিতে বা চুপি চুপি নালিশ করতে তার যতখানি লজ্জা হবে, শিক্ষককে অমান্য করতে, বা এমন কি মিথ্যা বলতেও অত হবে না। এই বয়সের যে কোনও দলের খেলায় সঙ্গীদের 'গোপনীয়' কথা থাকে, তা সহজে তারা বয়স্কদের কাছে বলতে চায় না। নানাবিধ 'গুপ্ত' ভাষা, হেঁয়ালী, সঙ্কেত উদ্ভাবন করার বয়স এটি। কোন কোন শিশুর এ বিষয়ে স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখা যায়; ছেলেদের তুলনায় মেয়েদেরই বোধ হয় এটি বেশী দেখা যায়, কারণ ছেলেদের কথার চেয়ে গোপনীয় কাজের দিকেই ঝোঁক অধিক থাকে। প্রায়ই এই গুপ্ত ভাষার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, এর সাহায্যে শিশুরা মনে ক'রে খুশী হয় যে, তারা নিজেদের পৃথক এক জগতে চলে গেছে, তাতে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রবেশ নেই। হয় ত এর মধ্যে অর্থহীন কয়েকটি শব্দ মাত্র থাকে, বড়রা নিকটে থাকলে তাঁদের ঠকাবার জন্যই এগুলি বলা হয়। কোন ক্ষেত্রে অবশ্য তাদের সঙ্কেত বা কথার সম্পূর্ণ ভাষাও থাকে; সে ভাষা তারা গল্প বা কোনও বড় গোছের খেলায় ব্যবহার করে। তাদের নিজেদের মধ্যে এই সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহারের ঝোঁক থেকে বয়স্কদের প্রতি তাদের মনোভাবের আসল পরিচয় পাওয়া যায়।

এই বয়সের শিশুরা সমবয়স্কদের সঙ্গে মিত্রতার জোর পায় বলেই প্রথম পিতামাতা ও শিক্ষকের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করে। এবং তাঁরা ঠিক যা, সেই ভাবেই তাঁদের তারা দেখতে পারে ; অর্থাৎ কম বয়সের কল্পনায় যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয় দেবতা, নয় রাক্ষস বলে তাঁদের মনে হত, তার পরিবর্তে এখন গুরুস্থানীয় মানুষ হিসাবেই তাঁদের দেখে। সখীদের সঙ্গে তারা বয়োজ্যেষ্ঠের দিকে বিচারের দৃষ্টিতে তাকাতে সাহস পায় ; এবং তাঁরা যে সম্মান চাইছেন, তা পাবার তাঁরা যোগ্য কি না, তারা তা দেখে নেয়। মা বাপ ও শিক্ষক যেমন তাদের উপর নজর রাখেন, তারাও ততখানি মনোযোগ সহকারেই তাঁদের আচরণ লক্ষ্য করে। অনেক সময়ে তারা এ সম্পর্কে এমন মতামত করে যে, তা শুনতে হয়ত অনেকেরই প্রীতিকর লাগবে না। শিশু মনোবিদ্যার একজন প্রখ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ রাসমুসেন (Rasmussen) লিখেছেন যে, তাঁর বড় মেয়েটি, তার বয়স তখন নয় বছর চার মাস, বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষয়িত্রী সম্বন্ধে এই কথা বলেছিল, "আমরা প্রথমা ও দ্বিতীয়া, দুজনের পড়াই ভাল পারি। প্রথমা যখনই শ্রেণী ছেড়ে যান, এই কথা বলেন, 'দেখি আমি যতক্ষণ বাইরে থাকব তোমরা কতখানি লক্ষী হয়ে থাকতে পার' আর ফিরে এসে একজনকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমরা লক্ষী ছিলুম কি না। কিন্তু দ্বিতীয়া এসব কিছুই বলেন না, আর তাতেই ত বাহাদুরী বেশী।"

এক আট বছরের শিশুর একটি ঘটনা বলি। তার শ্রেণীর বন্ধুর মা এক নিদারুণ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। মেয়েটি বড় বিষণ্ণভাবে সে কথা বাড়ীতে বলূলে, বন্ধু মেয়েটি খুব কাঁদছে, তার ছোট বোন নাকি মাত্র আট মাসের! আর তাদের শিক্ষয়িত্রী 'দিদি' নাকি ঘটনার শোচনীয় বিবরণ বন্ধুটিকে ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছেন। এই সম্পর্কে সে

অনুযোগের স্বরে বললে, "তিনি সব জানেন, তবু সমস্ত কথা তাকে খালি জিজ্ঞাসা করছেন ; বেচারীর কষ্ট হয় না বুঝি ?" এই ঘটনায় শিশুর নিজ সঙ্গীর প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ ও সহানুভূতি ছাড়াও দেখা যায় যে, সে বয়স্ক গুরুজনের আচরণ বুদ্ধিসহকারে লক্ষ্য করেছে, এবং তার খুব ন্যায়সঙ্গত সমালোচনাও শিশুটির মনে জেগেছে।

এই ভাবে শিশুরা আট নয় বছরে বয়োজ্যেষ্ঠদের ব্যবহার ভালরূপে লক্ষ্য করে ও সে বিষয়ে ভাবে, বিশেষতঃ যদি তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও আলোচনা করার উৎসাহ পেয়ে থাকে। যেখানে শৃঙ্খলা কঠোর ও এমন সমালোচনার মনোভাব দমন করা হয়, সেখানেও সমানভাবে এই পরিণতিই ঘটে ; শিশুরা একা থাকলে তাদের কথা ও আচরণে সে পরিচয় নিত্য পাওয়া যায়। শিক্ষকই হোন আর পিতামাতাই হোন, শুধু বয়সে বড় ব'লে আর তাঁরা শিশুদের কাছে নিজ নিজ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন না। সুবুদ্ধি ও দৃঢ়তা দুটি সুপরীক্ষিত গুণ, এগুলির সাহায্যেই কর্তৃত্ব লাভ করতে ও বজায় রাখতে হবে। যার ভিতরে কিছুমাত্র পদার্থ আছে, এমন শিশুমাত্রেই বয়স্কের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার শক্তি পরীক্ষা করবে, সে আমরা অনেকেই নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। শিশু সহজেই আমাদের দুর্ব্বলতা ধরে ফেলে ও মনে মনে তার নিন্দা করে ; নির্দ্দয়ভাবে তার সুযোগও সে নেয়। আবার বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে যাঁরা সহনশীল, প্রফুল্লচিত্ত ও আত্মবিশ্বাসী, তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাতেও সে সমান প্রস্তুত থাকে।

এক কথায় বলতে গেলে, আমাদের যোগ্যতা দেখলে এই বয়সের ছেলেমেয়েরা আমাদের বেশ বন্ধু হয়। তবে ছোট শিশুদের, ন্যায় এবং আবার পরবর্ত্তী কিশোরবয়সী ছেলেমেয়ের মত এরা বড়দের কাছে মনের গভীরতম প্রদেশের পরিচয় কখনও দেয় না। এই বয়সে

আমাদের প্রয়োজন তাদের অল্প, সঙ্গীদেরই দরকার অনেক বেশী রয়েছে। যদি আমাদের ব্যবহারে সুবুদ্ধি, ভদ্রতা, সখ্য, বয়সের ব্যবধান হলেও সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিচয় থাকে, উৎপীড়ন ও ভয়ের কারণ না থাকে, তবেই তারা আমাদের উপরে খুসী থাকে।

সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা বয়সের শিশুদের উপরে কর্তৃত্বের যথার্থ প্রয়োজন থাকলেও তা সদয় ও বিবেচনাযুক্ত হওয়া চাই। এই সময়ে তাদের মন যে কল্পনার আশ্রয় ছেড়ে সাধারণভাবে বাস্তবের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তার সঙ্গেও এটি সম্পর্কিত। সব বিষয়েই তারা সত্যিকার সাফল্য ও দক্ষতা লাভ করতে চায়। প্রথম শৈশব তাদের যত পিছনে পড়তে থাকে, ততই তাদের দৃষ্টিও বাস্তব জগতের উপরে নিবদ্ধ হয়, এমন কি তাদের স্বপ্নেও এই পৃথিবীতেই সার্থকতা পেতে চায়। এখন আর তারা রূপকথার রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই করার স্বপ্ন দেখে না; বাঘ, হাতী শিকার করবার, বিমান চালাবার কল্পনা করে। আট বছর বয়সের পরে শিশুরা প্রায়ই পরীদের উপকথা ছেড়ে আসল জন্তু জানোয়ারের গল্প বা সুদূর দেশের দুঃসাহসিক কাহিনী পড়ে। একথা অবশ্য মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ক্ষেত্রে অধিক সত্য, কারণ মেয়েদের পরীর গল্পের প্রতি আগ্রহ আরও বেশী বয়স অবধি থাকে। মেয়েরাও সত্যিকার জীবজন্তুর গল্প ভালবাসে, তবে বন্য জন্তুর চেয়ে বিড়াল কুকুরের মত গৃহপালিত প্রাণীর গল্পের প্রতিই তাদের ঝোঁক বেশী। উপকথা, পৌরাণিক গল্প ও প্রাচীন কাহিনীর সম্বন্ধে আগ্রহ এ বয়সেও থাকে, কিন্তু পরবর্তী বয়সে উপন্যাস ও নাটক পড়ার মত, এটি অনেকটা অভ্যাসের বশেই হয়ে থাকে, প্রথম শৈশবের দৃষ্টিতে পরীর গল্প কাল্পনিক রূপকথার মধ্যে যে বাস্তব রূপটি ফুটে উঠে, তা এর মধ্যে নেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে তাদের পড়ার ঝোঁকের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটে, পরে তার আবার ভাল করে আলোচনা করা যাবে। এই বয়সে শিশুর বাস্তব জগতের কর্ম্ম ও কৃতিত্বের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রবল হতে থাকে, এই কথাটি সাধারণভাবে বোঝাবার জন্যই এখন এই ব্যাপারের উল্লেখ করা হ'ল। তাদের নিজস্ব রচনার মধ্যে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত কল্পনার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে দেখলেও পরিণতির এই ধারার নিদর্শন পাওয়া যায়। আট নয় বছরের শিশুর লেখা গল্প কবিতা পড়লে স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে কিভাবে দৈত্য, ডাইনী, যাদুর আংটি, ইত্যাদির রাজ্য ছেড়ে দিয়ে প্রতিদিনের বাস্তব জগতের মতই এক দেশের দিকে এগিয়ে আসছে। এইসব লেখায় দুঃসাহসিক ও বীরত্বপূর্ণ কীর্ত্তি প্রচুর থাকে বটে, কিন্তু সে সাহসিকতা অনেকটা বাস্তব জীবনের, পরীর রূপকথার দেশের বীরত্ব নয়। এক অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত শিশুকবিতা "বীরপুরুষ"। ছেলে ঘোড়ায় চড়ে নির্জ্জন মাঠের মধ্যে মায়ের পাল্কির পাশে পাশে চলেছে, এমন সময়ে ভীষণাকার দস্যুরা এসে আক্রমণ করল; আর ছেলে অসীম বীরত্বে একা যুদ্ধ ক'রে তাদের হারিয়ে দিলে, মা স্তব্ধ বিস্ময়ে খোকার কীর্ত্তি দেখতে লাগলেন। আসলে বর্ণনাকারীর বয়স ও শক্তি বেশী হলে এই ধরণের পৌরুষ দেখানো তার জীবনে একেবারে অসম্ভব হত না, কাহিনীর দুর্ব্বৃত্তগুলিও আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত। শিশু গল্পের শেষে তাই দুঃখ করে বলেছে—

রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।

এই সব বৈশিষ্ট্য দেখেই অভিজ্ঞ পর্য্যবেক্ষকেরা বলেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা পূর্ণ মাত্রায় বাস্তবধর্ম্মী। এই বাস্তব দৃষ্টি থেকে

বোঝা যায় যে, তারা স্থূল জগতের উপরে আধিপত্য পেতে ও কল্পনার ভাবরাজ্যকে সত্যকার কীর্ত্তি দ্বারা ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করে।

৬। ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা

শিশুশ্রেণী ও প্রাথমিক শ্রেণীতে, অর্থাৎ সাত বছরের আগে ও পরে, শিশুদের সামাজিক বিকাশে প্রধান যে পার্থক্যগুলি উপরে লক্ষ্য করা গেল, আবার সেগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যাক। একথাও অবশ্য সে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এই পার্থক্যগুলি কখনও চরমরূপে দেখা যায় না, মাত্রার তারতম্যের আকারেই দেখা যায়।

ছোট শিশুরা হল আত্মকেন্দ্রিক ও অহমিকাপরায়ণ। তারা সাধারণতঃ অন্য শিশুদের বয়োজ্যেষ্ঠের স্নেহ পাবার বা খেলনা নেবার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য করে। সঙ্গীদের প্রতি তাদের ভালবাসা দেখা যায় বটে, কিন্তু রেষারেষির ফলে সে ভালবাসা যে কোনও মুহূর্ত্তে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তারা এক সঙ্গে খেলা করে, কিন্তু তাদের লক্ষ্য স্পষ্ট-রূপেই স্বার্থপর হতে দেখা যায়; আর তারা স্থায়ীভাবে দল বাঁধতেও এখনও সক্ষম নয়। খেলার সাথীদের চেয়ে গুরুজনদের প্রভাবই তাদের সুখদুঃখের উপর অধিক প্রভাবশালী হয়, এবং তাঁদের আদর পাবার জন্য তারা অবাধে সঙ্গীদের ধরিয়ে দেয়। তাঁদের কাছ থেকে তারা স্নেহ ও আশ্রয় প্রত্যাশা করে, আর সামান্য দুষ্টামীর জন্য গুরুতর শাস্তির ভয়ও পোষণ করে। তার বাস আসলে বাস্তবজগতে নয়, কল্পনার রাজ্যে।

সাধারণতঃ আট থেকে এগার বছর বয়সের মধ্যে এই আত্মকেন্দ্রিক ভাবটি অনেক কমে যায়। এ সময়ে শিশু অন্যদের সঙ্গে আরও দীর্ঘ

কাল একসঙ্গে মিলে খেলা ও কাজ করতে পারে, এবং একার চেয়ে অপরদের সঙ্গে মিলে খেলাই তার বেশী ভাল লাগে। অন্য শিশুরা কেউ কেউ তার সহায়ক বন্ধু হয়ে উঠেছে, এ বন্ধুত্বের স্থায়িত্বও অনেক বেশী। তার রেষারেষি এখন খেলাধূলার প্রতিযোগিতার পরিচিত রূপ গ্রহণ করে, আর এই বয়সের শেষের দিকে সে নিজেকে কোনও একটি দলের অংশস্বরূপ বিবেচনা করতে শেখে। এখন সে মাতাপিতা ও শিক্ষকের মতামতের চেয়ে সঙ্গীদের সুখ্যাতি বা নিন্দাই গ্রাহ্য করে বেশী। বড়দের প্রতি তার মনখোলা ভাব আর থাকে না, তবে তাঁদের ভদ্রতা ও যথার্থ কর্ত্তৃত্ব সে মানে। পৃথক ইচ্ছামত খেলার চেয়ে সে বাঁধা নিয়মের ও ব্যবস্থার দলবদ্ধ খেলাই বেশী পছন্দ করে। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের মধ্যেও বাস্তবদৃষ্টি এসে যায়, এবং সে সত্যকার দক্ষতা লাভ করতে ও কাজ করতে চায়। তার নৈতিক বিচারে অধিক যৌক্তিকতা ও সহনশীলতা দেখা যায়, আর ভাবের উচ্ছ্বাসকে সে কতকটা বিরাগ ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

কোনও বিষয়ে প্রকৃত নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করবার শক্তি এ বয়সে শিশুর হয় না, অথবা কোনও আদর্শ অনুসরণ করে চলতেও সে পারে না, যদি না সে আদর্শ এমন মানুষদের ও জিনিষের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে, যাদের সে বেশ জানে ও বুঝে। সে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা ও কাজ করলেও, এখনও পর্য্যন্ত নিজের গৌরবই প্রধানতঃ তার অভীষ্ট থাকে। সঙ্ঘবদ্ধতাবোধের (team-spirit) সূচনা হয় মাত্র, কিন্তু তার পরিণতি ঘটে না। অন্য সকলের সঙ্গে মিলে খেলা করার অভ্যাস এবং সমবেত জীবনে দেওয়া নেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে এই বয়সে নিঃস্বার্থ সামাজিক প্রেরণার ভিত্তি গ'ড়ে উঠে।

এই সম্পর্কে কতকগুলি কার্য্যকরী সমস্যা এসে পড়ে। কারণ শিশুর পরবর্ত্তী সামাজিক জীবনের ভিত্তি সুগঠিত হবে কিনা, সে কথা এই বয়সের ঘটনাবলীর উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। সুতরাং শিক্ষকের পক্ষে এই সমস্ত ঘটনা যত্নের সহিত লক্ষ্য করা, এবং বিশেষ চিন্তা ও বিবেচনা সহকারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা অবশ্য দরকার।

শিশুর বয়সের যে বিভিন্ন ধাপ বা পর্য্যায়ে তার পরিণতির কথা আমরা আলোচনা করেছি,এর যে কোনও পর্য্যায়টিতে তারই স্থূল সীমার মধ্যে শিশুর বিকাশ আবদ্ধ থাকে, সে কথা ঠিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই সীমা খুবই চওড়া, আর শিক্ষার দ্বারা তার মধ্যে পরিবর্ত্তনের স্থানও যথেষ্ট রয়েছে। এ সীমা দ্বারা মোট সম্ভাবনাই সূচিত হয়, প্রকৃত বিকাশের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হতে পারে না। শিশুদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুসারে এ বিকাশের কতখানি তারতম্য হতে পারে, তার অনেক সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে। বাড়ীর একটিমাত্র শিশু, যাকে আট নয় বছর বয়স পর্য্যন্ত খুব ছোটর মত মানুষ করা হয়েছে, আর সেই বয়সের অন্য ছেলেমেয়ে, যারা বৃহৎ পরিবারের মধ্যে বা ভাল বিদ্যালয়ে পূর্ণতর জীবনের পরিচয় পেয়ে বড় হয়েছে,—তাদের তুলনা করলে এ প্রভেদ দেখা যাবে। আবার যে বিদ্যালয়ে শিশুর নড়াচড়াও মানা, শিশুকে নিজে হতে কিছুই করতে দেওয়া হয় না, এবং যেখানে তার সক্রিয় চেষ্টা উৎসাহ পায়, তার স্বাধীনতার আদর আছে, এমন দুই বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যেও এই পার্থক্য নজরে পড়বে।

অবশ্য কোনও পদ্ধতির শিক্ষাই কম বয়সী শিশুর মধ্যে বড় বয়সের ছেলেদের মধ্যে দৃষ্ট সাহচর্য্যের ভাবটি এনে দিতে পারে না, বা এগার বছরের বালকের মনে আঠার বছরের দৃষ্টি বা গুণাবলী ফুটিয়ে তুলতে পারে না। কিন্তু এই কথাও সমানভাবে সত্য যে, অল্প বয়সী শিশু যদি

তার বাল্যজীবন পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে পায়, তার স্বপ্ন কল্পনা-গুলি অবাধে প্রকাশ করবার আর নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জ্জন করবার সুযোগ পায়, তবে প্রাথমিক শিক্ষা বয়সেও এর সুফল তার স্বাস্থ্য ও সুবিবেচনা দেখা যাবে। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গীদের পূর্ণ ও সক্রিয় সাহচর্য্যে, সম্ভবমত সকল সামাজিক সুবিধার মধ্যে খেলা ও কাজ করতে দিলে, তাদেরও কৈশোর বয়সে উদার সামাজিক দৃষ্টি ও স্বার্থহীন আদর্শ আরও দৃঢ় ভিত্তি ও পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে।

সেই জন্যই প্রথমে শিশুর বিকাশের স্বাভাবিক ধারাটি জেনে নেওয়া আবশ্যক। তাই থেকে আমরা শিশুর কোন বয়সে বিশেষ প্রয়োজন কি, আর তার কাছ থেকে কিরূপ কুশলতা বা আমরা ন্যায্যতঃ আশা করতে পারি, সে কথা বুঝতে পারব।

একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আমরা জানি যে ছেলেরা সঙ্গীদের দোষ ধরিয়ে দিতে কখনও চায় না। শিক্ষক হয়ত কোনও ঘটনার সব কথা জানতে চান, আর তিনি এ বিষয়েও নিশ্চিত যে কোনও কোনও ছেলে সমস্ত জানে। সে ক্ষেত্রে কি তিনি তাদের একজনকে ভয় বা লোভ দেখিয়ে, অন্যদের ধরিয়ে দিতে বাধ্য করবেন? এরূপ সমস্যার সম্মুখীন আমরা প্রায়ই হয়ে থাকি। এবং এর মধ্যে যথার্থই এক আদর্শগত দ্বন্দ্ব আছে, তাও সহজেই বুঝা যায়। এক্ষেত্রে বালকেরা দলবদ্ধরূপে শিক্ষক ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে বিদ্যালয়ের বৃহত্তর জগতের একতা। শিক্ষক কোনও অস্পষ্ট নৈতিক আদর্শের কথা বলে তাদের কাছে অনুরোধ জানাতে পারেন, কিন্তু তারা সে আদর্শটি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট মনে করতে পারবে না। তিনি তাদের বন্ধুদের প্রতি আনুগত্যের বন্ধন ভেঙে দেবার সঙ্কল্প

করতে পারেন, কিন্তু তা কি বাঞ্ছনীয়? এমন অবস্থা হতে পারে যেখানে তাই করতেই হয়; কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমরা যদি শিশুদের পরস্পর বিশ্বস্ততার আদর করি, তবে তাদের সামাজিক বিকাশের ঢের বেশী সহায়তা হবে। এর বহুগুণ প্রতিদানও আমরা পাব, কারণ আমাদের উপরে তাদের বিশ্বাস ও নির্ভর বাড়বে, এবং তাদের মধ্যে যে বিস্তীর্ণতর আনুগত্যের ভাবটি আমরা চাই, তারও যথার্থ বিকাশ হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাজজীবন পরিচালনায় অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করাই ভাল। অধিকতর দূরদর্শিতা বা সংযম আমরা এখানে আশা করতে পারি না। তাই এই বয়সে শিশুদের ব্যাপক অর্থে 'স্বায়ত্ত-শাসনের' যোগ্যতা আসে না। এদের সে ভার দিলে তাদের সাধ্যের বহির্ভূত দায়িত্বই চাপিয়ে দেওয়া হয়। জটিল সম্পর্কাদি তারা তলিয়ে বুঝতে পারে না, আর যা সম্মুখে আছে, তা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখবার উপযোগী দৃষ্টিও তাদের হয় না।

তবে অবশ্য তাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতার সীমার মধ্যে যথার্থ দায়িত্ব তারা বহন করতে পারে। তাদের সে সুযোগ দেওয়া দরকার। তাদের নিজ নিজ আসনে স্থিরভাবে বসিয়ে রেখে কেবল তাদের কাছে সম্ভব যত সব নৈতিকগুণের ব্যাখ্যা করেই শৈশবের অহমিকার গণ্ডীর বাইরে তাদের আনা যায় না। শ্রেণীকক্ষের দেখাশুনা, হাতের কাজের জিনিষ ও পুস্তকাদি রাখা, বিদ্যালয়ের উদ্যানের যত্ন নেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে, অল্পমাত্রায় হলেও সুনির্দ্দিষ্ট ও সক্রিয় অংশ যদি তাদের দেওয়া যায়, তবে নিঃসন্দেহে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। প্রাথমিক শ্রেণীতে শিশুরা উঠবার পরেও মন্টিসরি ও কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি থেকে শেখবার অনেক কিছু থাকে। বিদ্যালয় গৃহের দেয়াল, আসবাব, জিনিষপত্র

পরিষ্কার রাখা, মেরামত ও সুসজ্জিত করা ইত্যাদি কাজে বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী করে শিশুদের সমবেতভাবে লাগান যেতে পারে। যেমন, সাধারণতঃ দেয়ালে সাজাবার জায়গাই থাকে না, যেটুকু থাকে, তা অনেক সময়ে বড়দের পছন্দ করা নানাবিধ ছবিতে ভরে দেওয়া হয়। এতে শিশুদের যৌথ চেষ্টা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান চর্চ্চার সুযোগ নষ্ট হয়, কারণ আমরা জানি এই বয়সের ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকায়, নক্সা রচনায় পর্দ্দা, বাক্স, তাক, ইত্যাদি দরকারী জিনিষ তৈরী করায় বিশেষ আনন্দ পায়; এসব জিনিষ সকলে ব্যবহার করে ও তাদের ভালও লাগে।

যাবতীয় শিল্প ও হাতের কাজ যদি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্যিকার প্রয়োজনের উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে সামাজিক শিক্ষার দিক থেকে তার মূল্য অনেক। বলা বাহুল্য যে ধরাবাঁধা পাঠ থেকে, অথবা শিল্পকর্ম্ম যন্ত্রবৎ শিক্ষা দিলে তা থেকে শিশুদের সহযোগিতার অভ্যাস হয় না। শ্রেণীতে চল্লিশজন শিশু প্রত্যেকে যদি একই সময়ে একই কাগজ, পিজবোর্ড বা কাঠের জিনিষ তৈয়ারী করে, তাতে কি সামাজিক শিক্ষা হতে পারে? যদি একটি সমবেত উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারই সব কাজ তাদের ভাগ করে দেওয়া যায়, আর প্রত্যেকের নিজস্ব অংশটি থাকে, যা অন্যদের থেকে পৃথক হলেও সমগ্র কাজটি করায় সহায়তা করে, তবেই সে শিক্ষা হবে। বিশেষতঃ, তৈয়ারী জিনিষটি যদি একটা নির্দ্দিষ্ট কাজে লাগে, যেমন এক প্রস্থ মানচিত্র, প্রাচীর সজ্জার নক্সা, রান্না, ছবি দেওয়া বিদ্যালয়ের পত্রিকা, জিনিষপত্র রাখার এক প্রস্থ বাক্স, বিদ্যালয়ের অভিনয়ের জন্য পোষাক ও দৃশ্যাবলী, তাহলে খুবই ভাল হয়। এসব জিনিষ অবশ্য খুবই ছেলেমানুষী এবং সাধারণ ধরণের হবে, তবে তৈয়ারী নিশ্চয়

হয়ে যাবে এবং সে কাজে শিশুরা প্রচুর আমোদও পাবে। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় হাতের কাজের সামাজিক ও ও সহযোগিতামুলক মূল্যের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়।

খেলাধূলার সামাজিক মূল্যও ক্রমশঃ সবাই আরও বেশী করে বুঝতে পারছেন। নানাবিধ প্রতিযোগিতামূলক খেলা, যেমন বেশী দূর পর্য্যন্ত লাফান, দ্রুত দৌড়ান, উঁচুতে চড়া, ঠিকভাবে বল নিক্ষেপ করা, এগুলিতে অন্য ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যে শিক্ষা রয়েছে, যে জেতার সঙ্গে হারাও শিখতে হয়, শুধু অন্যদের বিরুদ্ধে নয়, তাদের সঙ্গে সহযোগিতায় খেলতে পারাও চাই, একদিন নেতা আবার পরদিন আজ্ঞাবাহী হতে হবে, এই সবে সামাজিক বিকাশের প্রভূত সহায়তা হয়। এইসব অভিজ্ঞতা শিশুর প্রকৃতির সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যায় যে আমাদের অতি সুন্দর উপদেশেও তেমন ফল কখনও হতে পারে না। শিশু বড় হওয়ার প্রতি বছরে তার কার্য্যকরী সামর্থ্য যতখানি বাড়ে, ঠিক সেই অনুযায়ী গঠনই এগুলির সাহায্যে সাধিত হয়।

আবার সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় ইত্যাদিরও সমাজগত শিক্ষা কিছু কম নয়। নৃত্য ও অভিনয়ের উৎপত্তিই সমাজ জীবনের মধ্যে, এগুলির সঙ্গে আদিমযুগের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত সঙ্ঘবদ্ধ কৃত্যানুষ্ঠানসমূহ জড়িত রয়েছে। ছেলেমেয়েরা যখনই একসঙ্গে এই সবে যোগ দেয়, তখন তাদের যে সমবেত ভাবটি আসে, তা শেখান বা শেখা যায় না, শুধু অভিজ্ঞতা দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। এবং সে অনুভূতি তাদের ছেলেমানুষী আত্মকেন্দ্রিক গণ্ডীর অনেকখানি বাইরে টেনে নিয়ে যায়। বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড়ই শুভ লক্ষণ এই যে, গানবাজনা, নাচ ও অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃত হচ্ছে। সুবিবেচনার সঙ্গে পরিচালিত হলে, এগুলির শিক্ষা ও কৃষ্টিগত

মূল্য ছাড়া, শিশুদের সমাজ-বোধও এগুলি ভালরূপেই জাগিয়ে তুলতে পারবে।

আজকাল শিশুদের শিক্ষায় যে ব্যক্তিগত কাজ ও ব্যক্তিগত উন্নতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, বাঁধাধরা পাঠ্য বিষয়গুলিতে তার বিশেষ দরকার রয়েছে। আর শিশুর সামাজিক বিকাশের দিক থেকে তার পরিপূরক হ'ল এই ক্রিয়াগুলি, কারণ সামাজিকতা ও সঙ্ঘবদ্ধতাই এগুলির মূল ভিত্তি। কিন্তু এগুলির বেলায়ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার জন্য এই বয়সে খুব বেশী জোর করা ঠিক নয়, বা যথাসময়ের পূর্ব্বেই সঙ্ঘবদ্ধতাবোধ জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করাও উচিত নয়; তা করলে তাদের বুদ্ধিকে খর্ব্ব করা হবে। তারা নিজেদের কৃতিত্বে খোলাখুলি ভাবেই গর্ব্ব উপভোগ করুক; আর একসঙ্গে মিলে কাজ, জিনিষ গড়া খেলা, নৃত্য, গীত ও অন্য সব ক্রিয়া তার মনকে ক্রমেই সরস ক'রে তুলবে। আমাদের কর্ত্তব্য যথাসময়ে বীজটি বপন করে দেওয়া, তার ফল যথাসময়ে ফলবে। কাজের অভাবই হল নিষ্ফলতার মূল।

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধিগত বিকাশ

১। শিশুর বোধ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে শিশুরা চুপ করে শোনার চেয়ে তাদের নিজস্ব কাজের ব্যবস্থা যে শিক্ষায় আছে, তা অনেক বেশী ফলপ্রসূ ; এবং তার কতকগুলি কারণও বুঝান হয়েছে। সে কথা আমরা প্রধানতঃ সামাজিক শিক্ষার সম্পর্কেই বলেছি। এখন বুদ্ধিগত পরিণতির ক্ষেত্রে এই নীতির স্থূল তাৎপর্য্য কি সে আলোচনা করা যাক। এখানে পাঠককে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে, শিশুর জীবনের এই দুটি দিক স্বতন্ত্র নয়, শুধু আলোচনার সুবিধার জন্যই এই পার্থক্য করা হচ্ছে।

আর একটি কথাও উল্লেখ করা আবশ্যক। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাপ্রক্রিয়া, অভ্যাস, স্মৃতি, কল্পনা, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ও বিধিবদ্ধ আলোচনা থাকে। শিশুদের এই সমস্ত মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষায় যে সমস্ত হৃদয়গ্রাহী তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং বিদ্যালয়ের কাজে সেগুলির কার্য্যকরী তাৎপর্য্য কি, সে বিবরণও বইগুলিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থে আমাদের আসল আলোচনার বিষয় হ'ল শিশুরা নিজেরা কেমন, এবং জীবনকে তারা কিরূপ দৃষ্টিতে দেখে ; তাই তাদের মানসিক প্রক্রিয়া ও রীতি সম্বন্ধে নৈষ্ঠিক আলোচনার আমাদের প্রয়োজন নেই।

সুতরাং এখন সাত থেকে এগার বছর বয়সের শিশুর বুদ্ধিগত বিকাশের প্রশ্নটি সমগ্রভাবে ও শিশুরই সমস্যা হিসাবে দেখা যাক। শিশুর দিক থেকে বিচার করলে এটি হচ্ছে, যে পৃথিবীতে সে বাস করে, বস্তু ও মানুষের জগৎ, সেটিকে বুঝতে পারার বিষয়ে উন্নতি। এই জানবার চেষ্টা বা জিজ্ঞাসায় সে তার সর্ব্ববিধ শক্তি যতদূর পুষ্ট হয়েছে ততটাই প্রয়োগ করে। এগার বছর বয়সে যে সকল ব্যাপার সে বুঝতে পারবে, সেগুলি সাত বছরে তার পক্ষে বোধগম্য না হতে পারে, আর সাত বছরে যে ভাবে সে বুঝতে চেষ্টা করেছিল, এগার বছরের ছেলের চোখে তার কোনও সার্থকতা আর না থাকতে পারে। কিন্তু এ কথা সুনিশ্চিত যে, সকল বয়সেই সে কোনও পথে এবং কিছু মাত্রায় জগৎকে বুঝার চেষ্টা করে চলবে; কারণ তাকে এখানেই থাকতে হবে, ও নির্ব্বিঘ্নে বাস করতে হবে।

সব জিনিষ বুঝবার জন্ম শিশুর যে এই প্রবল চেষ্টা রয়েছে, তা ভুলে যাওয়া বা অবহেলা করার ত্রুটি বিদ্যালয়ে সহজেই ঘটতে পারে। গতানুগতিক পাঠ্যসূচী ও অধ্যাপনাবিধির গুরুভার আমাদের ও শিশুদের উপর এমনভাবে রয়েছে যে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সখগুলি বাইরে প্রকাশ হবার সুযোগ নেই, এবং আমরাও সেগুলি লক্ষ্য করবার অবকাশ পাই না। কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে, সে যেখানেই হোক, খেলার মাঠে সাধারণের বেড়াবার জায়গায়, বাসে ট্রামে, মাঠে জঙ্গলে, পল্লীগ্রামে বা সহরের পথের ভিড়ে, সেই শিশুদেরই আর একরূপ দেখা যাবে। মোটর ও রেলগাড়ী, চাষের ক্ষেত ও জীবজন্তু সম্বন্ধে তখন তাদের কি আগ্রহই লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ সাত বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়ে, যাদের আচরণে এখনও কৃত্রিমতা আসে নি, তাদের দেখলে ও তাদের কথা শুনলে তা আরও বেশী বুঝা যায়।

খেলা ও পড়া যে পৃথক জিনিষ, জীবন ও জ্ঞান যে স্বতন্ত্র, এমন ধারণা হবার পূর্ব্বে তাদের পর্য্যবেক্ষণ করলে, নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করা যায় যে তাদের বুদ্ধির সীমা অনুযায়ী জানবার ও বুঝবার কি অদম্য ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আকাঙ্ক্ষা তাদের রয়েছে।

এইরূপ ছোট বয়সে শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াসমূহ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে পড়ে; নড়াচড়া ও দৈহিক ভঙ্গীর সৌষ্ঠবসাধনের ঝোঁক, মন-গড়া কল্পনা এবং অন্তরের জগৎটি বাইরে প্রকাশের আনন্দ; বাস্তব জিনিষ ও ঘটনায় আগ্রহ ও বাইরের জগৎটি আবিষ্কার। শেষেরটির মূলও প্রথম দুটির মতই গভীরভাবে শিশুর স্বভাবে রয়েছে। খুব ছোট ছেলেও তার চারদিকে বহির্জগতে কি হচ্ছে তা জানতে চায়। একদিকে তার যেমন অন্য মানুষদের আচরণ বুঝবার চেষ্টা থাকে, অপরদিকে তেমনই তার নিজের ক্রিয়ার উপরে আগুন, জল, চলন্ত গাড়ী, ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া কিরূপ, তা সে জানতে চায়; আর এই দুই শ্রেণীর জ্ঞান থেকেই তার স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা আসে। যে শিশু একবার আগুনে পুড়েছে, সে আগুনকে ভয় করে শুধু এইটুকু বললেই ঠিক হ'ল না; সে শিশু আগুন ভাল করে দেখতে ও তার সব তথ্য জানতে চায়, অবশ্য তা বুঝবার পূর্ব্বেই যদি সে ভয়ানকভাবে দগ্ধ না হয়ে গিয়ে থাকে। শিশুর বুঝবার আকাঙ্ক্ষা কেবল দৈহিক আত্মরক্ষার চেষ্টাকে ছাড়িয়ে যায়। এ আকাঙ্ক্ষার মূলে শিশুর গভীরতম প্রক্ষোভ বা অনুভূতিগত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, বুদ্ধিমান ছেলের পক্ষে ত এটি এক নেশা বলা যায়। সে পৃথিবীকে জানবে ও আয়ত্তে নিয়ে আসবে, তবেই সে সেখানে নিরাপদ বোধ করবে।

শিশুর মধ্যে তিন চার বছর বয়সে, এবং ছয় সাত বছর বয়স পর্য্যন্তও এই জিজ্ঞাসা স্পষ্টরূপেই বিদ্যমান। পরবর্ত্তী শৈশবের পরের

অংশেও এ কথা খাটে, তবে তখন তার তাৎপর্য্য আর আমাদের সব সময়ে মনে থাকে না। মনে না থাকার কারণ, আমরা তাদের জানবার আকাঙ্ক্ষার প্রতি আর নজর করি না, এবং তারাও অনেক সময়ে তা চাপা দিয়ে রাখে। যখন তারা দেখে যে, তাদের নিজস্ব আগ্রহকে আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করছি না, তখন সাধারণতঃ আমাদের অনুমোদিত জিনিষের প্রতি আমাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আগ্রহ করবার তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে, কারণ মোটের উপর তাদের প্রকৃতি অনুগত ও নমনীয়, অর্থাৎ প্রয়োজন মত বদলাতে পারে। কিন্তু এই নমনীয়তার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে তা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে দোষ আমাদের, তাদের নয়।

এই প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষকের একটি বড় দরকারী কথা মনে রাখা দরকার। পড়াবার সময়ে, বিশেষতঃ প্রকৃতি-পাঠ, বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যাপনায়, শিশুর সত্যিকার ঝোঁক যে সব জিনিষে, যা তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে হবে। দুঃখের বিষয় শ্রেণীপাঠনায় এই গুরুতর ব্যাপারটি অনেক সময়েই অগ্রাহ্য করা হয়। তাই আমরা প্রায়ই এমন দেখতে পাই যে শিশু খুব মেধাবী, এবং তার মনে ভূমণ্ডল ও প্রকৃতি সম্বন্ধে, গাছপালা, ফুল, পশুপক্ষী সম্বন্ধে সাগ্রহ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা রয়েছে; অথচ প্রকৃতি-পাঠের পড়া তার আদৌ ভাল লাগে না, এর কারণ সে পাঠ নিতান্ত নীরস ও প্রাণহীন। বিশেষ ক'রে সহরের ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে খুব কম আসতে পায় ব'লে, তাদের পড়ান এমনই হওয়া দরকার যে, তা জীব ও উদ্ভিদ জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির সঙ্গে শিশুর একটা জীবন্ত যোগসূত্র গঠনে সহায়তা করতে পারে। শুধু জিনিষগুলি শিশুকে দেখালে ও বুঝিয়ে দিলে চলবে না,

বা নিজে লক্ষ্য করে দেখবার জন্ম তাকে দিলেও কাজ হবে না। শুধু এর দ্বারাই প্রকৃতির অসীম রহস্য, ক্রিয়া ও বৈচিত্র্যের তাৎপর্য্য তাদের অপরিণত মনে তারা সজীব ও সার্থকরূপে বুঝতে পারবে না। যদি তাদের উদ্যানে ও পল্লীগ্রামে অবাধে বিচরণ করার, নিজের চোখে প্রকৃতিকে দেখবার, কিছু সুযোগ দেওয়া যায়, নিজের হাতে যদি তারা গাছ থেকে ফুল ও ফল সংগ্রহ করতে পায়, তবেই এই পাঠের আসল মূল্য হতে পারে। শিশুরা তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় এমন সুযোগ পেলে, এই সব জিনিষ নিয়ে যা খুসী তাই করতে এবং এগুলির বিষয়ে অবাধে আলোচনা করতে পারলে এ সবের সঙ্গে তাদের বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎ যোগসূত্র গঠিত হবে, এবং তাদের মনে সৌন্দর্য্য বোধ ও উদ্ভিদ জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ জাগবে। কিন্তু যদি এক একটি অংশের উপরে বিধিমত পাঠ দেওয়া যায়, তাতে শিশুরা কিছু লক্ষ্য করতে পারে না এবং তার অর্থও বুঝে না, সুতরাং প্রকৃতি-পাঠ বা অন্য যে কোনও বিষয়েই সে পড়ায় কিছুই ফল হয় না।

শিশুর বাস গ্রামে হোক বা সহরে হোক, তার বুদ্ধি কম বা বেশী হোক, তার যথার্থ আগ্রহ ও প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতাসমূহই কেবল তার হৃদয়ে ও মনে প্রবেশ করবার সোজা পথের সন্ধান দিতে পারে। সব চেয়ে বোকা ছেলেও নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জগৎকে বুঝতে চায়; আর যারা বেশী বুদ্ধিমান, তারা বিদ্যালয়ে যা শেখে, ঘরে ও বাইরে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায়ই তা স্পষ্ট ও সার্থক হয়ে উঠা দরকার।

এর পরে তা হলে শিশুর সাত থেকে এগার বছর বয়সে পৌছানর সময়টিতে তার কি কি স্বতঃস্ফূর্ত্ত আগ্রহ জাগতে পারে, আর এই

সীমার মধ্যে বিভিন্ন কালে তার অভিজ্ঞতাগুলি সে কি কাজে লাগায়, তারই মোটামুটি আলোচনা আমরা করব।

২। শিশুর কর্ম্মসূচী

শিশুর মনে তার বাসভূমি পৃথিবী সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা থাকে, তার উল্লেখ একটু আগে করা হয়েছে। আর শিশুর এই জিজ্ঞাসার কথা মনে রেখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্ম্মসূচী পরিকল্পনা করলে তা সব চেয়ে বেশী সাফল্যযুক্ত হবে।

এমন নীতি অনুসরণ করার প্রথম সুফল এই যে, শিশুর আগ্রহ সমূহের একত্ব বা অখণ্ডতার বিষয় আমরা উপলব্ধি করতে পারি। শিশুর দৃষ্টির, বিশেষতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীচের দিকের শিশুদের চক্ষে জ্ঞানের রাজ্য আপনা হতে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত হয়ে দেখা দেয় না,—ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-পাঠ, পাটীগণিত, মাতৃভাষা ও সাধারণ পাঠ্যতালিকার অন্যান্য বিষয়ে ভাগ হয়ে যায় না। আমরা বিদ্যালয়ের সারা দিনটি এই ভাবে ভাগ করে দিই বটে; কিন্তু শিশুর নিজের প্রেরণাগুলির মধ্যে এমন কোনও বিভাগ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার সম্পর্ক পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে নয়, জিনিষ ও ক্রিয়ার সঙ্গে, বস্তু সম্বন্ধে সে জানতে চায় ও কাজ করতে চায়।

এই বিষয় বিভাগের কথা বাদ দিয়ে, শিশুর নিজস্ব ক্রিয়ার মধ্যে যে বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে আমরা করেছি, সে পার্থক্যও শুধু আলোচনার সুবিধার জন্যই করা হয়েছে; শিশু নিজে এমন কোনও পার্থক্য অনুভব করে না। আগে যেমন বলা হয়েছে যে, সাত বছরের কম বয়সী শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াবলী লক্ষ্য করলে সেগুলিকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়—দৈনিক ক্রিয়ানৈপুণ্যের অনুরাগ, মন-গড়া কল্পনার

আনন্দ ও বাইরের জগৎটি আবিষ্কার। কিন্তু তার বাস্তব আচরণে এই তিন অংশ ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত দেখা যাবে। সে সহজেই এর এক শ্রেণীর ক্রিয়া থেকে আর এক শ্রেণীতে চলে যায়, আর তার সাময়িক উদ্দেশ্যসাধনে সব কটি একসঙ্গে অনুসরণ করে।

এই সূত্রে পাঁচ বছরের ছেলের রেলগাড়ী খেলার উদাহরণ দেওয়া যায়। অনুকূল অবস্থায় এই ঝোঁকের নানা বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যাবে। কখনও শিশু নিজেকে ইঞ্জিন কল্পনা করে, ইঞ্জিন হয়ে হাত দুটি ঘুরাতে ঘুরাতে চারিদিকে গোল হয়ে দৌড়ে বেড়ায়; নিজে যেমন শুনেছে তেমনই আসল ইঞ্জিনের মত মুখ দিয়ে নানা শব্দ করে। একটু পরেই দেখা যায় যে সে ইঞ্জিন গড়তে বা আঁকতে লেগে গেছে। তার পর হয়ত সে ইঞ্জিনের ছবির বই দেখতে আরম্ভ করে, আর সেগুলির আকার, গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন করে। এর পরেই তাকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে সত্যিকার ইঞ্জিন দেখিয়ে আনবার জন্য সে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয়।

শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে এই নানাবিধ ক্রিয়া একসঙ্গেই বদলায়। যেমন, তার হাতের নৈপুণ্য বাড়ার সঙ্গে, একদিকে বাস্তব জীবনে তার কার্য্যকরী উদ্দেশ্যগুলি সাধনে, অন্যদিকে তার ভাব ও কল্পনা প্রকাশে, এটি কাজে লাগে। জগতের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় যত বিস্তৃত ও গভীর হয় তার অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গীও তেমনই পরিবর্ত্তিত হয়। কল্পলোক ছেড়ে ক্রমশঃ সত্যিকার গল্প শোনবার তার ঝোঁক হয়, বর্ত্তমান ও অতীতের বাস্তব ঘটনাসমূহ কল্পনার সাহায্যে বুঝবার চেষ্টা দেখা দেয়।

দশ এগার বছর বয়সেও বুদ্ধিমান ছেলেদের সব রকম ইঞ্জিন ও কলকব্জার প্রতি আকর্ষণ থাকে। তবে সে এখন আর নিজে ইঞ্জিন হতে চায় না, এমন ছেলেমানুষী কল্পনার কথা সে হেসেই উড়িয়ে দেবে।

আসল জ্ঞান পাওয়ার ফলে তার কল্পনা অনেক সংযত হয়েছে এবং তার বোধশক্তিকে সহায়তা করেছে। ইঞ্জিন, মোটর গাড়ী, জাহাজ ও বিমানপোতের আবিষ্কার এবং উন্নতি যাঁরা করেছেন, ও যাঁরা এগুলিতে চড়ে বিস্তীর্ণ মহাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, মহাসাগরে পাড়ি দিয়েছেন, তাঁদের সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তাঁদের বিপদ ও সাফল্যের কথা সে শুনতে ভালবাসে, আর স্বপ্নে সে নিজেওএই সব দুঃসাহসিক কার্য্য করে। রেলের ইঞ্জিন ও বিমানপোতের ক্রমোন্নতি কি ভাবে হয়েছে, সব চেয়ে আধুনিক যন্ত্রটিতে কি বিষয়ে আগেরটির তুলনায় উৎকর্ষ হয়েছে, এ সব কথা জানতে তার ভাল লাগে। সম্ভব হ'লেই সে এই সবের ক্রিয়া স্বচক্ষে দেখবার জন্ম যাদুঘর ও প্রদর্শনী ঘুরে আসে। ইঞ্জিন ও যন্ত্রাদির বিষয়ে তার নানা কৌতূহল আছে, সুযোগ পেলেই সে সম্বন্ধে সে প্রশ্ন ও আলোচনা করে, আর বই পড়ে।

রেলগাড়ী সম্বন্ধে এই যে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল, তা থেকেই দেখা যাবে যে শিশুর যে জিনিষে ঝোঁক হয়, উপযুক্ত সুযোগ থাকলে সে সম্বন্ধে সব রকমের যাবতীয় তথ্য নিয়েই তার মনের ক্রিয়া চলতে থাকে। বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে যে বিভাগ আমরা করে নিয়েছি, ইতিহাস, ভূগোল, বলবিদ্যা (mechanics), অর্থনীতি, শিশুর এই প্রচেষ্টায় সেগুলি এক হয়ে যায়। আর তার মনের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া, কল্পনা, বোধ, ভাষা, কার্য্যকরী শিল্পগত নৈপুণ্য সমস্তই এই আগ্রহের সহায়করূপে কাজ করে। তা হলেও, শিশুর এ আগ্রহের বাস্তব ও ব্যবহারিক রূপটি কিন্তু বরাবর বজায় থাকে; তার ঝোঁকটি থাকে সত্যিকার ইঞ্জিন আর এরই সংশ্লিষ্ট লোকেদের প্রতি, ইঞ্জিন সংক্রান্ত সূক্ষ্ম বিজ্ঞান ও শৃঙ্খলাবদ্ধ তথ্যের প্রতি নয়।

যে সব ছেলের বুদ্ধি বেশী এবং যাদের মনে যন্ত্রপাতির ক্রিয়া সম্বন্ধে

আগ্রহ আছে ও ক্রমপর্য্যায়ে তার চর্চ্চা করবার সুযোগও রয়েছে, তেমন ছেলেদের আচরণ সাধারণতঃ কিরূপ হয়, তাই উপরে বলা হয়েছে। যাদের বুদ্ধি ও সুযোগ কম, তাদের অনুশীলনের বিস্তার ও গভীরতা এত বেশী হবে না। কিন্তু তাদের চেষ্টা অনেকটা সাদাসিধা ও অপটু হবে বটে, তবে তাদের মানসিক ক্রিয়া প্রায় একই পথে চলবে।

উপরের সবিস্তার উদাহরণ থেকে আরও একটি কথা বুঝা যায়। শিশুর এই সব বিদ্যালয়-বহির্ভূত ক্রিয়ার মধ্যেই শিক্ষক তাকে নূতন দৃষ্টিতে দেখতে পান, তার মধ্যে শিশুর কি হওয়া উচিত ও কি করা উচিত, এই সব অভ্যস্ত বিধির বিড়ম্বনা থাকে না। যে কোনও বিষয়ই পড়ান হোক না, শিশুর মানসিক ক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যটি ভালভাবে বুঝে সেই অনুযায়ী যিনি পাঠ দিতে পারেন, তিনিই কুশলী শিক্ষক। ইতিহাস পাঠনায় প্রাণ সঞ্চার করতে হ'লে শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক যে জিনিসগুলি আছে, তার কল্পনা, ছবি ও বীরত্বের কাহিনীর প্রতি অনুরাগ, জিনিষ তৈরী ও অভিনয়ের সখ, মানুষ ও ঘটনা সম্বন্ধে আন্তরিক কৌতূহল, এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তারই দ্বারা বাস্তব অতীতের জ্ঞান ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হবে। সফলভাবে মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে হলে, শিশুর নিজ আসল অভিজ্ঞতা অনুভূতি ও কল্পনা কথায় প্রকাশ করবার যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। হাতের কাজের ভাল শিক্ষক তাঁর নিজের গঠননৈপুণ্য ও পারিপাট্যের সখকে প্রাধান্য না দিয়ে, শিশুর তাড়াতাড়ি জিনিষ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাই বেশী মনে করবেন ; আর তিনি এই কথাও বেশ বুঝতে পারবেন যে শিশুর এই গড়বার ইচ্ছা তার জগৎকে বুঝবার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষারই একটি অংশ। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্পের ইতিহাসে হাতের কাজটির স্থান কি, সে কথা শিক্ষকের জানা আবশ্যক, তা হ'লে শিশুদের শ্রেণীগত

কাজকে তাদের অন্যান্য কর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখবার প্রবৃত্তি আর তাঁর হবে না। বুনিয়াদী শিল্পশিক্ষায় তাই এইরূপ ব্যবস্থা রয়েছে।

শিশু যে প্রধানভাবে তার নিজের জীবনকে সমগ্রভাবে বুঝতে চায়, এই বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ শিক্ষাসংস্কারকদের অনুপ্রাণিত করে এসেছে। এবং কোনও কোনও প্রতিভাশালী শিক্ষকও এই আদর্শের প্রভাবে তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে খণ্ডিত পাঠ্যসূচী ও সময়তালিকার উর্দ্ধে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু এখন এই সুফল আমরা সকলেই পেতে পারি; কারণ এটি আর শুধু মনীষী সংস্কারকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; এখন এই ধারণা বহু প্রত্যক্ষ ও সকলের জানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে, সাধারণ শিশু মনোবিজ্ঞানের দৈনন্দিন অংশ হয়ে উঠছে। শীঘ্রই ক্রমে দেখা যাবে যে এর প্রভাবে বিদ্যালয়ের কাজ সম্বন্ধে শিক্ষকের ধারণা এবং শিক্ষাদানের সমুদয় পদ্ধতিও বদলে যাচ্ছে।

সুতরাং কি ভাবে জীবনধারণ করতে হবে, শিশুদের এই শিক্ষা দেওয়া বিদ্যালয়ের অতি গুরুতর কর্ত্তব্য। এবং পাঠ্যতালিকার ব্যবস্থা করার সময়ে এই উদ্দেশ্যটির উপর সম্পূর্ণ জোর দিতে হবে। এমন না করা হলে পাঠ্যসূচীর প্রত্যেকটি অংশ কতকগুলি ক্রমোন্নত মানের বাঁধাধরা পাঠের সমষ্টি মাত্র হয়ে দাঁড়াবে, শিশুর নিজ ধারণা, ইচ্ছা ও ক্রিয়াগুলির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

শিশুর আগ্রহসমূহ মূলতঃ যে এক, এই কথাটি ভালভাবে বুঝলে সময়তালিকা ও নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যসূচীকে ঠিকমত কাজে লাগান যাবে; আমরাই যেমন অনেক সময়ে এগুলির দাস হয়ে পড়ি, সে ভুল আর হবে না। শিশুর যাবতীয় সমস্যাগুলি যথাযথভাবে সাজিয়ে নেওয়ার জন্য সময়তালিকা শুধু এক যান্ত্রিক সহায় মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। এটি কোনও প্রাকৃতিক বা নৈতিক বিধান নয়, যদিও অনেকে যেন সেই

রকমই মনে করেন। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীচের দিকের চেয়ে উপরের ছেলেদের শিক্ষাতেই এর মূল্য বেশী। শৈশবের আগ্রহ ও ক্রিয়াগুলিকে বিধিমত 'বিষয়ে' ভাগ করার সম্পর্কেও এই কথাই খাটে। এই বিভাগও ছোটদের চেয়ে বড়গুলির পক্ষে অধিক উপযুক্ত, কারণ দশ এগার বছর বয়সে ছেলেরা জ্ঞানচর্চ্চার বিভিন্ন অংশগুলিকে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র লক্ষ্যরূপেই দেখতে আরম্ভ করে। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বিষয়গুলি শিশুদের দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত রাখা যাবে, সেগুলির সজীবতা ও সার্থকতাও ততখানি থাকবে।

৩। আগ্রহের বিকাশ

শিশুর বয়স সাত থেকে এগার বছর হওয়া পর্য্যন্ত তার চারদিকের সব মানুষ ও বস্তুদের জানবার আকাঙ্ক্ষা কেমন নানাভাবে বদলাতে থাকে, তাই এখন আরও বিস্তারিতভাবে দেখা যাক। জ্ঞান ও পটুতা বাড়ার সঙ্গে তার বিশেষ আগ্রহগুলিরও পরিণতি ও পরিবর্ত্তন হতে থাকে। পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজন সে সব বয়সেই বোধ করে, কিন্তু পূর্ণ জীবনের উপাদান সব বয়সে এক নয়। ছোট শিশুর মনে জগৎ বলতে যা বুঝায়, এগার বছরের ছেলের বা আঠার বছর বয়সের যুবকের দৃষ্টি থেকে তা অনেকাংশে বিভিন্ন। বয়স বাড়ার সঙ্গে শিশু তার প্রেরণা ও ক্রম পরিণত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জিনিষ ও ধারণা বেছে নেয়, ও এইভাবে বিভিন্ন সময়ে এক এক রকমের জ্ঞান ও ক্রিয়ার অনুসরণ করে। শিশুর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের বিশেষ প্রয়োজনটি ভালরূপে বুঝে ঠিক সেইমত শিক্ষা দিলে তার মনও সেই অনুযায়ী পুষ্টি লাভ করতে পারবে।

কোনও বয়সে শিশুর প্রধান আগ্রহ কোন ক্রিয়াগুলিতে, সে কথা কোথায় কি ভাবে জানা যাবে? আমাদের বিশ্বাস, প্রধানতঃ দুটি জায়গায় তা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ের বাইরে, বাড়ীতে, বাগানে, খেলার মাঠে বা পথে যে ক্রিয়াগুলি সে নিজের খুশীমত করে, যে সব খেলা খেলে, যে সমস্ত জিনিষ নিজের হাতে তৈরী করে, যেরূপ বই পড়ে, যে ধরণের প্রশ্ন করে, যে সব রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, এ সমস্ত থেকে তার ঝোঁক কোন দিকে তা বুঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের কৃত্যগুলির মধ্যেও কোনগুলি সে যথার্থ উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে করে, তাও দেখতে হবে। যে কাজটি করতে পেলে শিশুর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়, কণ্ঠস্বর ও ভঙ্গীতে ব্যগ্রতা দেখা যায়, তারই ভিতরে, সেই ধরণের প্রচেষ্টার মধ্যেই শিশুর বিকাশের আদিসূত্র রয়েছে, তা বুঝা যায়।

উভয় স্থলেই, অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ও বাইরে, আমরা এই বয়সের শিশুর নিজের ঝোঁকগুলির মধ্যে খেলাধূলাকেই বেশী প্রাধান্য দিই; অবশ্য খেলার এটি সঙ্কীর্ণ অর্থ, কারণ শিশু যা ক'রে আনন্দ পায়, আসলে তাই ত তার কাছে খেলা। এই খেলাধূলাই তার দৈহিক ও সামাজিক বিকাশের প্রধান সহায়। এর কথা এখানে বেশী না বললেও চলবে, কারণ শিশুদের সামাজিক শিক্ষায় ক্রীড়াদির বিশেষ গুরুত্বের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হয়েছে; আর তাছাড়া আমরা ক্রমেই খেলার মূল্য অধিক বুঝতে পারছি ও তার আদরও বাড়ছে। অবশ্য খেলাধূলার কার্য্যকরী ব্যবস্থা ও বিস্তারের দিকে অনেক কিছুই বাকী রয়েছে। কারণ যে সব খেলার শিশুদের অত্যধিক প্রয়োজন, যেগুলিতে তাদের শক্তি ও দক্ষতা বাড়ে, স্থান ও উৎসাহের অভাবে এখনও অনেক শিশুই তা খেলতে পায় না।

আর এক শ্রেণীর ক্রিয়ার প্রতি এই বয়সে শিশুর খুব ঝোঁক দেখা

যায়, সেগুলি হচ্ছে, গান, নাচ ও অভিনয়। এগুলি সে নিজে হতেই করে, আর উপযুক্ত শিক্ষার গুণে এসব বিষয়ে নৈপুণ্য এলে আরও বেশী উৎসাহ নিয়ে করে। শিশুশ্রেণী থেকে প্রাথমিক শিক্ষার পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়ার পরও শিশুর এই সবের আগ্রহ ও আনন্দ কমে না। এই বিষয়ে তাকে সর্ব্ববিধ সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন, এবং এখনকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পূর্ব্বেকার চেয়ে ঢের বেশী এগুলির স্থান থাকা বাঞ্ছনীয়।

অনেক সময়ে মনে হয় যে এই বয়সে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই অভিনয় করার প্রতি আকর্ষণ বেশী। একথা সত্য যে 'সাজবার' এবং দর্শকদের সামনে নানা ভঙ্গীতে নিজেকে দেখাবার সখ মেয়েদেরই বেশী প্রবল ও ছেলেমাহুষী ধরণের। ছেলেরা অধিক আত্মসচেতন, এবং নিজেদের ত্রুটিও তারা বেশী সহজে বুঝে ; তাছাড়া ব্যক্তিগত মর্য্যাদার বোধও তাদের কম বয়সে হয়। তা হলেও সাধারণতঃ বালক অভিনেতার বয়স ও স্বভাবের সাথে নাটকের ভূমিকাটির মিল হওয়ার উপরই সবটুকু নির্ভর করে। ছেলেরা যখন শিকার, যুদ্ধ, আবিষ্কারের খেলা খেলতে থাকে, সেও এক রকম নাটক অভিনয় ছাড়া অন্য কিছু ত নয়। পার্থক্য শুধু এই যে, এক্ষেত্রে ক্রিয়াটি তার নিজের, সে যে নূতন গৌরবের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে সেটি তার নিজস্ব, নাটকের ভূমিকার মত সেটি অন্যের প্রশংসা পাবার জন্য নয়। এই বিষয়ে বোধ হয় ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে সত্যই পার্থক্য বিদ্যমান। নিজে হতে সুখ্যাতি পাবার জন্য এগিয়ে যাওয়া ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পক্ষে বেশী সহজ ও স্বাভাবিক। ছেলেরা কেবল তখনই ভাল অভিনয় করতে পারে, যখন নাটকটি তাদের কল্পনাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে, এবং ভূমিকার কথাই তাদের মনে থাকে, শ্রোতাদের দিকে আর খেয়াল

থাকে না। আর তেমন হ'লে তারা আবার অনেক সময়ে তাদের অভিনয়ে মেয়েদের চেয়ে বেশী সৃষ্টিপ্রতিভা ও শক্তির পরিচয় দেয়। যে ভূমিকা কোনও ছেলের 'ছেলেমানুষী', বুদ্ধিহীন বা অমর্য্যাদাকর মনে হয়, তেমন ভূমিকা তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শুধু অবিবেচনা নয়, খানিকটা নিষ্ঠুরতাও বটে। আট নয় বছরের ছেলেদের একটি ব্যাপার আমরা সর্ব্বদাই দেখতে পাই। তারা যদি এমন কোনও নাটকের দৃশ্য পড়ে বা তার অভিনয় দেখে যেটি তাদের মনে লাগে, যেমন ইতিহাসের কোনও বীরত্বের কাহিনী, তা হ'লে তখনই তারা নিজেরাই সেটি অভিনয় করতে চায়। অপরের সাহায্য বিনাই তারা সেটি শিখে প্রস্তুত ক'রে নেয়, এবং তাদের অভিনয় প্রচেষ্টায় অন্ততঃ উৎসাহ ও নাটকীয় গাম্ভীর্য্যের অভাব থাকে না।

আরও ছোট বয়সের খেলায় যে ছেলেমানুষী নকলের উল্লেখ আগে করা হয়েছে, যে সব খেলায় শিশু কখনও হয়ত 'পিতা' সাজে আবার কখনও 'চিকিৎসক', কখনও 'বাস পরিচালক' কখনও বা 'সৈনিক' হয়ে পড়ে, তার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বয়সে এই অভিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ আছে। তবে কম বয়সের স্বপ্ন কল্পনার যে নাটকাভিনয়ের সীমা-বদ্ধ ক্রিয়াটুকুই একমাত্র পরিণতি, তা নয়; সে আমরা আগেই দেখেছি। বড় শিশুর যে সমস্ত বীরত্বের খেলা আছে, হিংস্র জন্তু শিকার, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই, অজ্ঞাত অরণ্য অঞ্চল আবিষ্কার, অসভ্য জাতিদের পশ্চাদনুসরণ, যা নিয়ে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেতে থাকে, সে সবই মন-গড়া কল্পনার প্রেরণা। তবে এ খেলাগুলিতে শিশু অধিকতর বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দেয়, এবং কোন্‌টি সম্ভব এবং কোন্‌টি মায়ালোকের স্বপ্ন, সে বিচারবুদ্ধিও বেশী দেখা যায়। সাত থেকে এগার বছরের মধ্যে শিশুর নিজস্ব জীবনে এই ধরণের ক্রিয়াই খুব বেশীর

ভাগ থাকে। যখনই সুযোগ আসে, এগুলিতেই তার আনন্দ, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে তার জ্ঞান ও দক্ষতা যত বাড়ে, এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে ততই সত্যিকার সার্থকতা দেখা যায়।

এই জাতীয় খেলার ব্যবস্থা ও পরিচালনা ঠিকমত হ'লে তার মধ্যে অনেকখানি বাস্তব জ্ঞানও আনা যায়, স্কাউটদের (scouts) ক্রিয়াকলাপে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। মানচিত্র রচনা ও ব্যবহার, আবহাওয়ার লক্ষণ বুঝা, পশুপক্ষীর জ্ঞান, পল্লীর সাধারণ গাছপালা ফুল ফল, সহরের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, গ্রাম বা সহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলার ভৌগোলিক পরিচয়, এ সমস্ত শিক্ষারই সূত্রপাত এইভাবে হতে পারে। শিশুর বয়স এগার বার বছরের কাছাকাছি পৌঁছলে তার প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন হয়, আর নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করবার ও বাইরের জগৎকে আয়ত্ত করবার আকাঙ্ক্ষাও তার জাগে ; এর ফলে সে গ্রামে বা সহরে ক্রমেই অধিক দূর পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াতে চায়। বিস্তীর্ণ ও বিধিবদ্ধ জ্ঞানের এই তার সুযোগ। এই সময়ের ভ্রাম্যমাণ নেশাটি কাজে লাগালে সুফল পাওয়া যাবে, কিন্তু অবহেলা করলে তা পালিয়ে বেড়ান ও অন্যায় প্রবৃত্তিতে পরিণত হবে, সে দায়িত্ব আমাদের।

উপরের কথাগুলি ছেলেদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, কিন্তু এখনকার দিনে তার অধিকাংশই উপযুক্ত পরিবর্ত্তন করে নিলে বালিকাদের বেলায়ও প্রায় সমান ভাবেই খাটে। তেমন সুযোগ পেলে মেয়েরাও সহরের রাস্তা চিনে নেওয়া, পাহাড় জঙ্গলে পথ বার করা, মানচিত্র থেকে অবস্থিতি নির্ণয় করা, প্রভৃতি ব্যাপারে সমরূপ দক্ষতা দেখায়। ছেলেদের ও পুরুষদের যে এই সমস্ত কাজে স্বাভাবিক ভাবেই অভ্যস্ত ও নির্ভুল হতে দেখা যায়, তা প্রায় সম্পূর্ণই অল্প বয়স থেকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও উৎসাহ পাওয়ার ফল।

এই যে ছেলেরা মনের আনন্দে মাঠে জঙ্গলে বা সহরেও রাস্তায় ও উদ্যানে বেড়িয়ে বেড়ায়, তার মধ্যেও আবার চিন্তার অবসর মেলে। আর সেগুলি অবাধে প্রকাশ করবার সুযোগ দিলে, এই সব ছোট ছেলেরাও তাদের মনের ভাব গদ্যে কবিতায় লেখে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পন্ন পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা, তাদের ভাব স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করবার ও লেখবার জন্য উপযুক্ত উৎসাহ পেলে, অনেক সময়ে গদ্যে বা পদ্যে সুন্দর মৌলিক রচনা লিখতে পারে। এই সব লেখার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতির নিদর্শন পাওয়া যায় তা পূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই অর্জ্জন করা সম্ভবপর, আর সময়ে সময়ে এগুলিতে যথার্থ সাহিত্য প্রতিভারও পরিচয় থাকে।

এ ছাড়া জিনিষ গড়ার আনন্দও শিশুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছোট বয়সের শিশুদের এই ঝোঁকের কথা আগে বলা হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীভুক্ত হবার পরও তা তাদের পূর্ণমাত্রায় থাকে। সব বয়সের শিশুই নিজের হাতে দ্রব্যাদি তৈয়ারী করতে বড় ভালবাসে। তাই ডিউই পদ্ধতি (Dewey Plan) বা বুনিয়াদী শিক্ষা ইত্যাদি নূতন প্রণালীর শিক্ষায় শিশুর এই বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। ডিউই এক জায়গায় বলেছেন, "শিশুর কিছু করবার ঝোঁক রূপায়িত হয় প্রথমে তার খেলা, নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গী ও মন-গড়া কল্পনার মধ্যে, পরে তা ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট রূপ নেয়, তখন প্রত্যক্ষ আকার ও স্থায়ী গঠনের জিনিষ গড়ায় তা প্রকাশ পায়।" অধ্যাপক বার্ট অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে নয় থেকে বার বছরের মধ্যে সব বয়সী ছেলেরই চিত্তবিনোদনের অতি প্রিয় ও সাধারণ উপায় হ'ল জিনিষ তৈয়ারী করা। ছেলে সব সময়েই হাতে একটা কিছু নিয়ে গড়ছে, আর এ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকলে সে তার খেলার বা অভিনয়ের জন্যই কিছু

প্রস্তুত করবে। সাত বছর থেকে সে যত এগার বছর বয়সের দিকে এগোতে থাকে, ততই প্ল্যাস্টিসিন, মাটী, কাগজ, ইত্যাদি সহজ জিনিষ ছেড়ে, কাঠ, পেস্টবোর্ড, প্রভৃতি যেগুলিতে অধিক যত্নের প্রয়োজন হয়, সেই সব নিয়ে গড়বার সখ হয়। প্রথম থেকেই, হয় ত সাত বছরের আগেই দেখা যায় যে নানা উপকরণ দিয়ে সে নিজের উপস্থিত প্রয়োজন অনুযায়ী সামগ্রীটি প্রস্তুত করে নিচ্ছে, আর এমন নির্ম্মাণ কৌশল সে দেখাচ্ছে যা তার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার অনেক উপরে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে উপযোগী মালমশলা, সুষ্ঠু গঠন, ঠিকমত মাপ ও আকার ইত্যাদিরও ঝোঁক বেশী হয়। ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই তখন জিনিষ তৈয়ারী করার সঙ্গে, দ্রব্যটির উৎকর্ষ সম্বন্ধেও খানিকটা জ্ঞান এসে যায়। কিন্তু এই পর্য্যায়ের শেষের দিকেও, অর্থাৎ এগার বছরেও গঠনের সঠিক মাপ ও সূক্ষ্ম পারিপাট্যকে প্রধান লক্ষ্য ব'লে ধরা উচিত নয়। শিশুকে হাতের কাজ শেখাতে গিয়ে মাঝে মাঝে এই ভুল করা হয়। পরিচ্ছন্নতার জন্য শিল্পসৌন্দর্য্য ও হিসাবের জন্য অভিনবত্ব বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, নীতিনিষ্ঠায় কাজের সোপান ভাগ করতে গিয়ে স্বাধীন সৃষ্টির আনন্দ অন্তর্হিত হয়। এক্ষেত্রে জিনিষটি নিখুঁত ও পরিপাটি করে তোলাই প্রধান লক্ষ্য মনে করলে আসল বস্তুটি ছেড়ে তার ছায়া ধরতে যাওয়ার সমান হয়, কারণ এর প্রকৃত কোনও সার্থকতা এই বয়সের শিশুদের মনে থাকে না, এবিষয়ে জোর করলে তাদের আগ্রহ ও চেষ্টাই বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের হাত ও চোখের নৈপুণ্য বাড়লে, এবং গড়া ও কাজ করা উপযুক্তরূপে চললে, এই গুণ তাদের যথাসময়ে হবে।

শিশুদের বাস্তব জিনিষ প্রস্তুত করার মূল্য খানিকটা আমরা বুঝেছি বটে, কিন্তু তা হলেও অনেক সময়েই তারা কি তৈয়ারী করবে, তা

মেয়েদের পুতুল খেলা

গাছপালার ঝোঁক
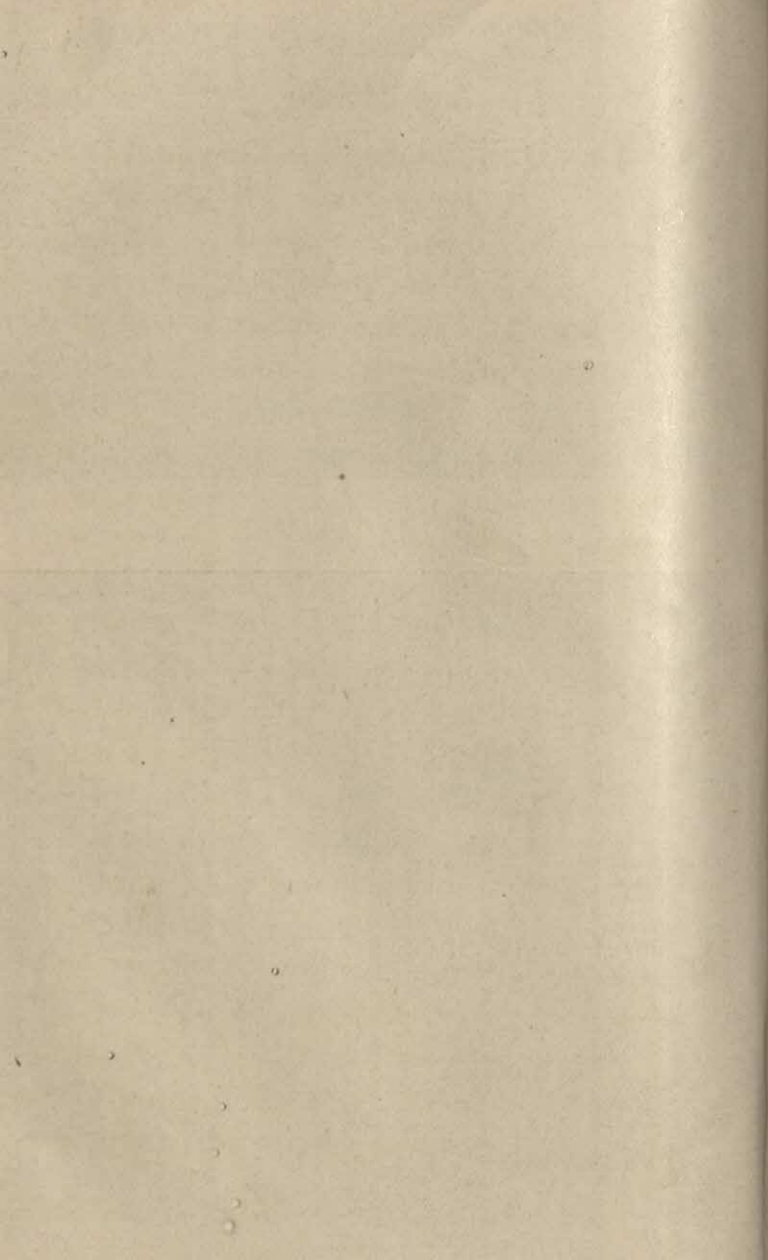
নির্ব্বাচন আমরাই করে দিই, আর প্রায়ই সে নির্ব্বাচনে ভুল হয়। যে পাঠ্যতালিকা আমরা রচনা করি, তাতে বেশীর ভাগই ট্রে, কাগজ রাখার তাক, ইত্যাদি অতি সাধারণ বস্তু থাকে; আমাদের এগুলি ভাল লাগলেও ছোটদের কোনও উৎসাহই এগুলিতে থাকে না। এ সম্বন্ধেও অধ্যাপক বার্ট বিশেষ জ্ঞানের কথা বলেছেন যে, নিজে নড়ে যে সব জিনিষ, বা যা অন্য কিছুকে নড়ায় ও চালায়, সেগুলিই সাধারণতঃ সাত থেকে এগার বছরের শিশুর মনকে আকৃষ্ট করে। শিশু যে সব জিনিষ নিয়ে খেলা করে, বা যেগুলি তার বিদ্যালয়ের ব্যাপারে কাজে লাগে, সে সব তৈয়ারী বা মেরামত করায় সে অত্যন্ত উৎসাহ দেখায়। কাঠ ও পেস্টবোর্ড নিয়ে ছোটখাট যন্ত্রগুলি সে ভালই ব্যবহার করতে পারে, তবে আগেই বলা হয়েছে যে এই বয়সে একেবারে ত্রুটিহীন, সৌখীন কাজ আশা করা উচিত নয়। যাতে তার কার্য্যকরী উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এমন জিনিষ গড়েই সে নিজে সন্তুষ্ট; আমাদেরও তাতেই সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক।

মেয়েরাও আজকাল এই সব ধরণের গড়ার কাজ ক'রে আনন্দ পায়। তবে স্বভাবতঃ মেয়েদের সৃষ্টির সখ প্রাচীন গার্হস্থ্য শিল্পগুলিকে, যেমন সেলাই, বোনা, বেতের কাজ, মাটির জিনিষ তৈয়ারী, প্রভৃতিকে অনুসরণ করে। এগুলির যোগ রয়েছে আরও ছোট বয়সে পুতুলের সংসার নিয়ে খেলার সঙ্গে, তবে এ খেলাও যে প্রাথমিক শিক্ষার বয়সের শেষ পর্য্যন্ত চলতে না পারে এমন নয়। এগার বছরের অনেক মেয়েরই পুতুল খেলা ও তাকে নানা বৈচিত্র্যের ও নানা দেশের পোষাক পরাবার সখ দেখা যায়।

সাধারণতঃ এই বয়সের মেয়েরা সজ্জামূলক চিত্রাঙ্কন, আল্পনা বা রংয়ের বিন্যাস ছেলেদের চেয়ে বেশী ভালবাসে; ছেলেদের নির্ম্মাণ

পরিকল্পনার উপরে অধিক ঝোঁক থাকে। ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই নক্‌সা ছবি আঁকার সখ দেখা যায়। সুযোগ থাকলে এবং ছবি আঁকার উপকরণ পেলে তারা এতেই দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেয়; বিশেষতঃ গ্রীষ্মের ছুটিতে বা বর্ষার দিনে, যখন অনেকখানি সময় ঘরের মধ্যে থাকতে হয়, তখন এ কাজটিতে বড় আনন্দ। তাদের আঁকবার প্রিয় বিষয় হচ্ছে মানুষ বা কোনও গতিশীল জিনিষ। অন্যের ছবি নকল করবার বা কোনও স্থির বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলি ফটোগ্রাফের মত নিখুঁতভাবে আঁকবার ঝোঁক তাদের বড় দেখা যায় না। এগুলি তাদের মনে কোনও সাড়া এনে দেয় না, আর সৌন্দর্য্যবোধ শিক্ষার দিক থেকে এগুলির কিছুই মূল্য নেই। শিশুর মনের ধর্ম্ম সৃষ্টি করা, শুধু নকল করা নয়। জগতের যে নাটকীয় রূপটি তার নিজের চোখে ধরা পড়ে, তাই সে খড়ি রং তুলির সাহায্যে প্রকাশ করে। শিশুরা নিজের মনে যে সব মানুষ, জীবজন্তু, চলন্ত জাহাজ বা মোটরগাড়ীর ছবি আঁকে, সেগুলিতে অনেক সময়ে বিশেষ শক্তি ও স্পষ্টতার ছাপ দেখা যায়। ছবি আঁকার সময়ে তারা খুঁটিনাটির দিকে অত মন না দিয়ে, ঘটনার গতির উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে, আর সেইভাবে রেখায় আকারে রংয়ে সেটি চিত্রিত করে। তার পরিচয় আমরা যে কোনও শিশুদের চিত্র প্রদর্শনীতে গেলেই দেখতে পাই; বড়ই সুখের কথা এই যে এরকম প্রদর্শনীর আদর ক্রমেই বাড়ছে। তাদের কোনও কোনও ছবির সঙ্গে পুরাপ্রস্তর যুগের চমৎকার গুহাচিত্রগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং আধুনিক পদ্ধতির চিত্রকরদের ছবির সঙ্গেও সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ে যাঁরা ছবি আঁকা শিক্ষা দেন, দুঃখের বিষয় তাঁদের অনেকেই একথা জানেন বা এ বিষয়ে গ্রাহ্য করেন না। এই চিত্রাঙ্কনের ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী করে বলা যায় যে, শিশুকে

শিক্ষা দেবার আগে প্রথমে তার কাছ থেকেই শিখে ও জেনে নেওয়া বিশেষ দরকার।

আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু যে শুধু শিল্পী ও কারিগর, তা নয়। তার সম্পত্তি সংগ্রহ ও রক্ষারও খুব সখ। তাই এই বয়সে তাদের পকেটগুলি হরেক রকম জিনিষে বোঝাই হয়ে থাকে, মায়েদের দৃষ্টিতে সেগুলি বাজে হলেও, সেগুলির মালিকদের কাছে তা অমূল্য। ছয় সাত বছরে ট্রাম ও বাসের টিকিট ও সব রকমের লেবেল সংগ্রহ করার ঝোঁক, দশ এগার বছরে ডাকটিকিট, ঝিনুক ও আরও নানা জিনিষের সখ, এগুলি থেকে বুঝা যায় যে জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহের প্রবৃত্তিও কেমন বিস্তারলাভ করছে। সম্পত্তিরক্ষার ঝোঁক সব ছেলেমেয়েরই স্বভাবগত ও প্রবল এবং এই বয়সে এটি সব চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে। একে খোরাক না দিলে বা অবহেলা করলে এটি নিম্নগামী হবে, ফলে হিংসা বা চুরিও দেখা দিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিসহকারে এটি কাজে লাগালে শিশুর আত্মসম্মান জ্ঞান ও বোধশক্তির বিকাশ সাধনে এর বড়ই সাহায্য পাওয়া যায়। শিশুর নিজস্ব বই, ডেস্ক, যন্ত্রপাতির সখ তার লেখাপড়ার পক্ষে খুব সহায়ক। শিশুদের সংগ্রহ প্রবৃত্তিকে বিদ্যালয়ে অসংখ্য রকমে ফলপ্রদ করা যেতে পারে। এটিকে উৎসাহ দেবার আর একটি পন্থা হচ্ছে বিদ্যালয়ের দ্রব্যাগার (school museum) এখনকার শিক্ষাবিৎগণ এটিকে বিদ্যালয়ের অমূল্য ও অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে গণ্য করেন। তবে এ সম্পর্কে স্মরণ রাখতে হয় যে দ্রব্যাগারের বস্তুগুলি প্রধানতঃ শিশুদের দ্বারাই সংগৃহীত হবে। তাদের নিজেদের হাতের সংগ্রহ যদি ছেলেমানুষী ও অসম্পূর্ণও হয়, হয়ত তাদের মনের মত বস্তু ও স্থানের কতকগুলি ছবি, নিজেদের কুড়িয়ে আনা ঝিনুক ও পাখীর পালক,

দশ বছর বয়স হলে ছেলেমানুষী সোজাসুজি ধরণের পরীর রূপকথার আকর্ষণ মেয়েদেরও কমে আসে। কিন্তু পুরাণ কাহিনী আর আধা ঐতিহাসিক রং ফলানো বীরত্বের গল্পের উপর খুব ঝোঁক এখনও থাকে। জীবনচরিত পড়বারও প্রকৃত আগ্রহ এই বয়সে জন্মায়, সে সঙ্গে ভ্রমণ ও নানা স্থান আবিষ্কারের কাহিনীর প্রতি অনুরাগও বাড়তে থাকে। এগুলির সঙ্গে শ্রেণীর ইতিহাস ও ভূগোল পাঠের এক নূতন যোগসূত্র হয়।

ছেলেদের মধ্যে আবার মেধাবী যারা, তাদের অনেকে এই বয়সে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বলবিদ্যার (mechanics) বিষয়ে বই পড়তে চায়। সাধারণ বুদ্ধির ছেলেদেরও ঠিকভাবে ধরাতে পারলে, এই শ্রেণীর গ্রন্থ পড়বার সখ আর একটু বেশী বয়সে খানিকটা জন্মায়, যেমন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া, বিমান, যন্ত্রাদি ও রাসায়নিক আবিষ্কার, প্রভৃতির কথা পড়বার তাদের ঝোঁক হয় ; তবে বুদ্ধিমান ছেলেদেরই এই আগ্রহ স্থায়ীভাবে থাকে ও বেড়ে চলে। আর তার চেয়েও ভাল লাগে রহস্য রোমাঞ্চ ও দুঃসাহসের গল্প, এমন কি গোয়েন্দা কাহিনী পড়ারও খুব সখ হয়।

কিন্তু বালকদের প্রিয় এই সমস্ত বিষয়, বিশেষতঃ বিজ্ঞানের বই মেয়েরা বেশী পড়ে না, তাদের ভালও লাগে না। এগার বছরের বালিকাও পুরাণ সাহিত্যের সেকালের মেয়েদের গল্প পড়ে, বালিকা-বিদ্যালয়ের, গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী ভালবাসে ; জীবজন্তুর গল্পের আকর্ষণও সাধারণতঃ এখনও থাকে। আজকাল কিন্তু দেখা যায় যে অনেক মেয়েই ছেলেদের দুঃসাহসিক কাহিনী বেশ পছন্দ করে। এই থেকে বুঝা যায় যে তাদের শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা সুনিশ্চিত পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং তা ক্রমে বাড়ছে। কিন্তু বলবিদ্যা যন্ত্র ও বিজ্ঞানের গ্রন্থের কোনও আকর্ষণ এগার বছরের মেয়ের থাকে না।

ছেলেমেয়েদের পড়ার সখের মধ্যে আরও একটি দরকারী বিষয় এখন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, তা হচ্ছে মানবদেহের জ্ঞান। এগার বছর বয়সে একটু বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের শারীরবিজ্ঞানের সহজ তথ্যগুলি জানবার আগ্রহ নিঃসন্দেহে হয় ; আরও ছোট বয়সে প্রাকৃতিক ইতিহাস পড়ার যে সখ থাকে, এটির উৎপত্তি সাধারণতঃ সেই থেকেই হয়। কিন্তু এ বিষয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থার কিছুই উন্নতি এখনও হয়নি, তার কারণ এ বিষয়ে ভাল ও হৃদয়গ্রাহী পুস্তকের বড় অভাব, এবং এ ব্যাপারে সবাইয়ের ঔদাসীন্যও রয়েছে। শারীরবিজ্ঞান আজকাল এই বয়সের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু তার পাঠ্যপুস্তক ও পড়াবার পদ্ধতি, উভয়েরই প্রচুর উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। এই বিষয়ে উপযোগী ও সুপাঠ্য গ্রন্থের অভাব দূর করা বিশেষ দরকার। ছেলেমেয়েদের এই বিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়লে তার শিক্ষাগত মূল্য খুব বেশী হবে, ও পরে এই থেকেই ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি ও জীববিদ্যার সমগ্র ক্ষেত্রটি তাদের সামনে উন্মুক্ত হবে।

৪। শিশুদের চিন্তা

শিশুদের সাত থেকে এগার বছর বয়সের মধ্যে প্রধান সখ কি কি, এবং সেগুলি এই সময়টির মধ্যে কি ভাবে বদলায় ও বিকাশ পায়, তার মোটামুটি বিবরণ উপরে দেওয়া গেল। কিন্তু শিশুর মনের একটা স্থূল চিত্র দিতে হ'লেও, শুধু সে কি করতে বা কি শিখতে চায়, তা দেখলে চলবে না ; তার মনের চিন্তা কিভাবে ক্রিয়া করে, তারও পর্য্যালোচনা করা দরকার। শিশুর বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে তার মনের আগ্রহগুলি যেমন পরিবর্ত্তিত হয়, তার নিজস্ব বুঝবার ধরণও তেমনই বদলাতে থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন বয়সে শিশুদের এই জগৎ দেখবার ও এর বিষয়ে চিন্তা করার প্রণালী যে পৃথক, সে সত্য অবশ্য অনেকদিন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এ পার্থক্যগুলি কিরূপ, তার সবিশেষ বিবরণ আমরা সম্প্রতি মাত্র জেনেছি। এর আগে আমাদের জানা অল্প কয়েকটি স্থূল তথ্যের উপরই নানা ব্যাপক সাধারণ সিদ্ধান্ত গঠন করা হ'ত; নূতন তথ্য সংগ্রহ করবার এবং এগুলিকে আরও নির্ভুল করার চেষ্টা তেমন ছিল না।

শিশুর বিকাশ সম্বন্ধে আগে এইরকম একটি কথা আমরা বিজ্ঞের মত আলোচনা করতুম যে, সে জীববিদ্যার ধারা অনুযায়ী মনুষ্যজাতির পরিবৃত্তি (re-capitulation) বা ক্রমোন্নতির ধারাটি অনুসরণ করে, অথবা মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধারাবাহিকভাবে যে এক একটি 'কৃষ্টির যুগ' (culture-epoch) লক্ষ্য করা যায়, শিশুর ক্রমপরিণতিতেও এগুলি সেইভাবে দেখা দেয়। এইসব অনিশ্চিত তথ্যকে ভিত্তি করে, শিশুকে বিভিন্ন বয়সে কি শিক্ষা দেওয়া হবে, তার নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা পর্য্যন্ত সম্প্রতিও হয়েছে। যেমন কেউ কেউ বলেছেন যে ইতিহাস শিক্ষার প্রথম আরম্ভ আদিম গুহাবাসী মানব থেকে হওয়া উচিত; তার একমাত্র কারণ হল এই যে, সাত আট বছরের শিশুর মনের সঙ্গে পুরাপ্রস্তর যুগের আদিম মানুষের কল্পিত সাদৃশ্য আছে।

এইসব অপরিণত নীতির দ্বারা কিন্তু আসল তথ্যগুলির যথোপযুক্ত আলোচনার ব্যাঘাতই হয়েছে মাত্র, আর বিশেষ কোনও কাজ হয়নি। তাই আমরা এগুলিকে আর এখন বিশেষ সহায়ক মনে করি না। সাধারণ সিদ্ধান্তের ঝোঁক আমাদের অনেকটা কমে গেছে, ভালভাবে ও ধৈর্য্যসহকারে বাস্তব তথ্যগুলি লক্ষ্য করার ইচ্ছাই এখন বেশী দেখা যাচ্ছে।

সুতরাং শিশুদের চিন্তা সম্বন্ধে যে সব সাধারণ তথ্য জানা গেছে, সেগুলি ভালরূপে পর্য্যালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে তার সার্থকতা কি, তাও লক্ষ্য করতে হবে। এই ব্যবহারিক তাৎপর্য্য যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ একটি সাধারণ ব্যাপার থেকে তা বুঝা যাবে; তাই আগে তারই কথা সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে।

শিশুর মন যুক্তি ধ'রে চলতে পারে কিনা, এই সম্পর্কে বিপরীত দুইটি ধারণা প্রচলিত আছে, আর এই উভয়কে আশ্রয় ক'রে. বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে শিশুকে শিক্ষা দেবার প্রণালীতেও দুইটি বিপরীত রীতি এখনও অনেকস্থলে দেখা যায়। আবার অনেক সময়ে একই শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে ও ব্যাপারে উভয় বিরুদ্ধ মতবাদই প্রয়োগ করে থাকেন; কারণ শিশুর প্রতি আচরণে নিজের ধারণাগুলি কার্য্যকরী সার্থকতা পরীক্ষা করে নেওয়ার আগ্রহ খুব কম লোকেরই আছে। এর ফল দাঁড়ায় এই রকম।

অনেকে মনে করেন যে ছেলেমেয়ের বয়স অন্ততঃ তের চৌদ্দ হ'লে তার যুক্তির ক্ষমতা হঠাৎ আবির্ভূত হয়, তার আগে এ শক্তি থাকে না। সুতরাং তাঁরা আশা করেন যে, বুদ্ধিমান শিশুরাও সব রকমের আদেশ অন্ধভাবে নির্ব্বিচারে পালন করবে, তাদের বিধানও নির্দ্দেশের কারণ তাদের বুঝাবারও তাঁরা কখনও চেষ্টা করেন না। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সব রকমের নিয়মবদ্ধ ক্রিয়ার উপর, যেমন পঠন ও লিখনের যন্ত্রবৎ অনুশীলন, আবৃত্তিগত স্মরণশক্তির সাহায্যে অঙ্কশিক্ষা, ভূগোল ও ইতিহাসের মুখস্থ বিদ্যা, সামাজিক জীবনে উত্তম অভ্যাস গঠন, এই সবে সমধিক জোর দেওয়া হয়। শিশুকে যা বলা যায় যদি সে তাই করে আর তার নিয়মনিষ্ঠা ও শ্রমশীলতার অভ্যাস গঠিত হয় ও স্মৃতি কতকগুলি স্থূল তথ্যে বোঝাই হয়ে যায়, তবেই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে তার

শিক্ষাদাতার উপর কৃতজ্ঞ হই, আর মনে করি যে এসবের কারণ ও তাৎপর্য্য শিশু তার যুক্তির বয়স হলে নিজেই বুঝতে পারবে।

পক্ষান্তরে, অনেক সময়ে দেখা যায় যে এই সব লোকেরই আবার সততা, দয়া, শিষ্টাচার, পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি সূক্ষ্ম নৈতিক গুণ শিশুদের নৈষ্ঠিকভাবে শেখাবার অভ্যাস আছে। তাঁদের কাছে পাঁচ বছরের শিশু পর্য্যন্ত এই রকম নৈতিক উপদেশ পেয়ে থাকে। তাঁরা এমনই এক অসম্ভব কথা ভেবে নেন যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এ শিক্ষার বাস্তব ও ব্যবহারিক অর্থ আছে, এবং প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে এরই দ্বারা তাদের প্রবৃত্তি প্রয়োজনমত চালিত বা সংযত হতে পারবে। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, শিশুর সূক্ষ্ম নীতি বিচার করবার শক্তি হয়েছে ও সে সাধারণ ধারণার সাহায্যে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষমতা ঢের পরে হয়। আর আগেই বলেছি, এ ভুল সেইসব লোক করেন যাঁরা অন্যান্য ব্যাপারে, আর খুব ছোট ছোট বিষয়েও, শিশুর বিচারশক্তির কোনও অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁদের নৈতিক উপদেশও শিশুর নীরস লাগে, তা থেকে ফল কিছুই হয় না; যে সময়টুকু হয়ত সহযোগিতামূলক খেলা বা হাতের কাজ ইত্যাদিতে সার্থকভাবে লাগান যেত, তা বৃথা নষ্ট হয়।

এই দুই বিপরীত মতবাদের প্রভাব এখনও আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে যথেষ্ট বিদ্যমান থাকলেও এর কোনটিই সুসঙ্গত নয়। কোন বয়সে, কিভাবে শিশুর বিচারবুদ্ধি প্রথম জাগে এবং তাদের কথাবার্ত্তা ও ক্রিয়ার সঙ্গে তাদের যুক্তির কিরূপ সম্পর্ক থাকে, এই প্রশ্নগুলি বিশেষ যত্নসহকারে আলোচনা, করা দরকার। শৈশবে কোন সময়ে কিরূপে যুক্তির উন্মেষ হয় বা আদৌ হয় কিনা, আর প্রথম দিকেও একটু বড়

বয়সে শিশুর মন কোন কোন ভাবে ক্রিয়া করে, সে কথা পিতামাতা ও শিক্ষকদের জেনে রাখা বড়ই উচিত।

বিভিন্ন বয়সে শিশুদের চিন্তার স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ পরীক্ষামূলক তথ্য প্রথমে বার করেন মনোবিৎ বিনে এবং তারপরে বার্ট; শিশু মনোবিদ্যায় এঁদের অমূল্য দানের উল্লেখ পূর্ব্বে একাধিকবার করা হয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাঁরা বুদ্ধির মান নির্ণয় সম্পর্কে যে গবেষণা করেন, তা থেকে শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশের কথাও জানা যায়। এই মানসিক অভীক্ষাগুলির মূল্য, একই বয়সের বিভিন্ন শিশুর সামর্থ্যের ভেদ বিচারে এবং বিদ্যালয়ের শিশুদের শ্রেণীবিভাগে যে কতখানি, সে আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই করা হয়েছে। এখন আমাদের দেখতে হবে যে বুদ্ধির প্রতিটি বছরে স্বাভাবিক শিশুর চিন্তাধারা সম্বন্ধে এই অভীক্ষাগুলি থেকে কতটা জানা যায়।

বিনের মানদণ্ডটি নানা বয়সের শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়া তুলনা করে দেখবার পক্ষে খুব বেশী সহায়ক নয়। তার কারণ, এটির অন্তর্ভুক্ত বহু শ্রেণীর প্রশ্ন আছে, তার মধ্যে কতকগুলিকে চিন্তামূলক বলাই যায় না। তাহলেও এ সম্পর্কে দরকারী অনেক জিনিষও এটিতে আছে। যে প্রশ্নগুলিতে যথার্থ চিন্তার ব্যাপার আছে, এর মধ্যে থেকে সেগুলি বেছে নিয়ে, সেগুলিতে বিভিন্ন বয়সে শিশুদের সাফল্যের পরিমাণ যদি তুলনা করে দেখা যায়, তাহ'লে শিশুর চিন্তার বিকাশ কোন পথে চলছে তা অনেকটা বুঝা যায়।

উদাহরণস্বরূপ প্রথমে বোধশক্তির অভীক্ষা প্রশ্নগুলি দেখা যাক। চার বছরের স্বাভাবিক বুদ্ধির শিশু এইরূপ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারে, "যখন তোমার ঘুম পায়, বা শীত করে, বা ক্ষুধা পায়, তখন তুমি কি কর?" ছয় বছর বয়সে এই শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তর দেয়, "তুমি

বিদ্যালয়ে বেরুবার সময়ে যদি বৃষ্টি হতে থাকে, বা তোমাদের বাড়ীতে আগুন লাগে, বা হয়ত তুমি কোথাও যাচ্ছ আর দেখলে যে বাস আগেই ছেড়ে গেছে, তা হ'লে তখন তোমার কি করা উচিত?" আট বছরের প্রশ্ন, "যদি তুমি অপরের কোনও জিনিষ ভেঙে ফেলে থাক, বা বিদ্যালয়ে যাবার পথে দেখলে যে তোমার পৌছতে দেরী হয়ে যাবে, বা কোনও ছেলে যদি ইচ্ছা না ক'রে দৈবাৎ তোমায় আঘাত ক'রে ফেলে, সেক্ষেত্রে তোমার কি করা উচিত?" দশ বছরে এই রকম, "যে ছেলেকে তুমি ভাল ক'রে জান না, তেমন ছেলে সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি, কেউ যদি তা জিজ্ঞাসা করে, তা হ'লে তোমার কি বলা উচিত?" "কোনও লোককে বিচার করতে হ'লে তার কথার চেয়ে তার কাজ দ্বারাই তা করা উচিত কেন?" "গুরুতর কোনও কাজ আরম্ভ করবার পূর্ব্বে তোমার কি করা উচিত?"

এই ক্রমোন্নত পর্য্যায়ের যুক্তি প্রশ্নগুলি এখন ভালভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। দেখতে হবে যে, প্রথম দিকের প্রশ্নগুলি থেকে শেষেরগুলির পার্থক্য কোথায়; আর এগুলিতে এমন কি আছে যা দশ বছরের ছেলেমেয়ে পারে, কিন্তু চার বছরের শিশু পারে না।

প্রথমেই লক্ষ্য করা যাবে, যেগুলি খুব স্থূল ঘটনা, মুখ্যতঃ যা সাধারণ অবস্থা বা ব্যাপার, সেগুলির উপরে দখল বড় শিশুদেরই থাকে। ঘুম পাওয়া একটি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গত ব্যাপার, সহজ, স্পষ্ট ও অতি বাস্তব অভিজ্ঞতা। এর উল্লেখ হলেই এ সম্পর্কিত অনুভূতি ও সেই অনুভূতির সময়ে কি ঘটে, তার সত্যিকার স্পষ্ট প্রতিরূপ বা ছবি চোখের সামনে আসে। কিন্তু "গুরুতর কোনও কাজ আরম্ভ করা" প্রায় সাধারণ ধারণার ব্যাপার, এতে কোনও নির্দ্দিষ্ট একটি অভিজ্ঞতা বুঝায় না, অভিজ্ঞতা সমূহের একটি ধরণ বা শ্রেণী বুঝায়। শিশুকে এ প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করলে যখন সে এর উত্তর দিতে চায়, তখন সে অবশ্য এই শ্রেণীর কোনও নির্দ্দিষ্ট একটি অভিজ্ঞতার কথাই মনে করে; কিন্তু এই চিন্তায় মনের মধ্যে যে ছবিগুলি জাগে, সেগুলি পূর্ব্বের উদাহরণের মত সম্পূর্ণ নয়, এবং সেগুলির তেমন প্রত্যক্ষ ও স্থূল রূপও থাকে না।

সুতরাং শেষের ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ নয়, সাধারণ শ্রেণীভুক্ত; আর শুধু তাই নয়, এটি অধিক জটিলও বটে। দশ বছরের উপযোগী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে শিশুকে কি করতে হয়? অন্য শিশু ও লোকেদের সংস্পর্শে তার যে বহুবিধ অভিজ্ঞতা হয়েছে, কোন অবস্থায় মানুষ কি বলেছে বা করেছে, সে সব মনে এনে তুলনা ও বিচার করতে হয়। আর জটিল যুক্তি প্রয়োগ ক'রে এই সব ব্যাপার থেকে তার সার কথাটি বার করতে হয়। কম বয়সের প্রশ্নগুলি, যেমন চার বছরে 'ক্ষুধা পাওয়া'র কথা, বা ছয় বছরে 'বাড়ীতে আগুন লাগা'র প্রশ্ন, এগুলি যতটা প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ব্যাপার, দশ বছরের প্রশ্নগুলি তেমন নয়। এমন কি এই দুটি প্রশ্ন বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে বুঝা যাবে যে চার এবং ছয় বছর বয়সের মধ্যেই কি পরিমাণ উন্নতি হয়। ক্ষুধা পাওয়া ইত্যাদির বাস্তব অনুভূতি প্রত্যেক শিশুরই ভালভাবে জানা আছে। কিন্তু বাড়ীতে আগুন লাগার অভিজ্ঞতা খুব অল্প ছয় বছরের শিশুরই আছে; সে পরম সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে! কিন্তু শিশু এই বয়সে কথা ও ছবির সাহায্যে অন্যের অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করতে ও কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে; আর তারই সঙ্গে আগুনের ব্যাপার সে সাধারণভাবে যা দেখেছে তাই যোগ ক'রে সে বেশ স্পষ্টই কল্পনা ক'রে নিতে পারছে যে বাড়ীতে আগুন লাগলে সে কি করবে।

সুতরাং বড় ও ছোট শিশুদের এই সমস্যা-প্রশ্নগুলির একটি প্রধান প্রভেদ এই যে সেগুলির সমাধান করতে গেলে কতখানি

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে, তারই তারতম্য। শিশুর চিন্তার ক্রমোন্নতিতে 'যদি' এই সর্তমূলক শব্দটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; উপরের আট বছরের প্রশ্নাবলীতে তা আরও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাবে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিশুর যে ব্যাপার ঘটে নি, যা সম্ভাবনাই মাত্র, তার কথা চিন্তা করার শক্তির প্রথম উন্মেষ হয়েছে; এবং ব্যাপারটির বাস্তব অভিজ্ঞতা না হওয়া সত্ত্বেও তার সম্ভাব্য অবস্থা ও ফল সে কল্পনা করে নিতে পারে। খুব ছোট বয়সেই শিশুদের কল্পনামূলক খেলার মধ্যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত গঠন করার ক্ষমতার প্রথম সূচনা হয়, যেমন, "যদি অমুক ঘটনা ঘটে, তবে তার ফল এই হবে, অথবা তা হ'লে আমি এই করব।" এই প্রসঙ্গের আলোচনা পরে আবার করা যাবে।

সুতরাং উপরে বিবৃত অল্প কয়েকটি তথ্য থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে তার চিন্তারও পরিণতি চলতে থাকে। আর মাঝে মাঝে হঠাৎ কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন শক্তির আবির্ভাবের ফলে যে এই বিকাশ ঘটে, তা নয়। এতে দেখা যায় যে, শিশু নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনেকটা বাইরের ব্যাপারও আগেকার বয়সের তুলনায় ক্রমেই বেশী আয়ত্ত করতে পারছে। যে সব বিষয় তেমন স্থূল প্রত্যক্ষের নয়, বরং সাধারণ শ্রেণীভুক্ত, যাতে বেশী জটিলতা রয়েছে, যা বুঝতে অধিক জ্ঞান দরকার হয়, যার মধ্যে 'যদি' বা সম্ভাবনার ভাগই বেশী, সেগুলির উপর দখল তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বেড়ে চলেছে।

আধুনিক মনোবিদ্যার গবেষণা অনুযায়ী শিশুর এ পরিবর্তন এই ভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় যে, জটিল সম্পর্কসমূহ বিচার করবার, ও নিজ চিন্তায় সেগুলি স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে কাজে লাগাবার ক্ষমতা তার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিনের মানদণ্ডে যে একটি অভীক্ষা নানা বয়সের

শিশুকে দেওয়া হয়, তা থেকেও এই কথাটি বুঝা যাবে। এই অভীক্ষায় একটি ছবি দেখিয়ে শিশু ছবিতে কি দেখল, তাই বর্ণনা করতে বলা হয়। চার বছরের সাধারণ শিশু এই অভীক্ষায় ছবিতে যা যা জিনিষ আছে সেগুলির নাম করে দেয়, পর পর জিনিষগুলি দেখিয়ে দেয়। তার উত্তরে সেগুলির পৃথক পৃথক উল্লেখ থাকে, যেমন "চেয়ার, টেবিল, স্ত্রীলোক, ছোট মেয়ে, ইত্যাদি"; বর্ণনা দ্বারা এগুলি সংযুক্ত করা হয় না। শিশু ছবিতে দেখতে পাচ্ছে যে, স্ত্রীলোকটি চেয়ারে বসে আছে, টেবিলের উপরে পাঁউরুটি আছে, ঘরের মেঝেতে বিড়াল বসে রয়েছে, শিশুটি কাঁদিছে, ইত্যাদি। কিন্তু ছবির মধ্যে এই সব বস্তু ও ঘটনার পরস্পর যোগাযোগ কি আছে, তা বার করবার বা তাতে মনোযোগ দেবার মত শক্তি আর বিশেষতঃ উপযুক্ত ভাষায় তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা শিশুর এখনও হয় নি। তার পক্ষে জিনিষগুলির নাম করা মানেই তার অস্পষ্ট ধরণে এই সব বলা বুঝায়। কিন্তু সাত বছরের শিশু এই পরস্পর সম্পর্ক স্পষ্ট কথায় বুঝাতে পারে, যেমন, "শিশুটি কাঁদছে, তার মা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন," বা "একটি ছোট মেয়ে রয়েছে, সে কাঁদছে, আর তার মা বসে আছেন।" দশ বছরের ছেলেমেয়ে আবার আরও বেশী বলবে। সে শুধু যেটুকু চোখে দেখছে, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হবে না, আরও বৃহত্তর চিন্তার সূত্র ধ'রে, কারণ, উদ্দেশ্য, প্রভৃতি সম্পর্কও বার করবে। তার উত্তর সম্ভবতঃ এই রকম হবে, "শিশু কাঁদছে কারণ তার ক্ষুধা পেয়েছে, আর তাকে খেতে দেবার কিছু তার মায়ের নেই," অথবা, "ছোট মেয়েটি দুষ্টামী করেছে, তাই তার মা তার উপরে রাগ করেছেন।" অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ছবিটি দেখে ছেলেমেয়ের মনে যে চিন্তা জেগে উঠে, তা তার নিজের দেখা, শোনা বা অনুভব করা ঘটনাগুলির স্মৃতিই কেবল নয়। শিশুরা কখন

ও কেন কাঁদে, এর সঙ্গে তাদের নিকটে উপস্থিত বয়স্ক ব্যক্তির সম্পর্ক কি, ইত্যাদি বিষয়ে তার পূর্ব্বলব্ধ ধারণার প্রভাবও তার চিন্তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ছবিতে মাতা ও শিশুর ক্রিয়া এরকম দশবছর বয়সের ছেলে মেয়েদের চোখে একটি সংযুক্ত ব্যাপার—এর সমগ্র রূপটি যে তারা শুধু দেখতে পাচ্ছে তাই নয়, চিন্তার দ্বারা এর প্রত্যেক অংশ বিশ্লেষণ ক'রে তাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধও বুঝতে পারছে। আর এই জটিল ঘটনাটি কথায় বর্ণনা করছে। স্থতরাং শিশুর চিন্তাশক্তির ক্রমোন্নতি দুটি জিনিষের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। প্রথমতঃ, শিশুর একসঙ্গে অনেকগুলি ঘটনা ও সেগুলির পরস্পর সম্বন্ধের কথা সংযুক্ত ভাবে চিন্তা করবার শক্তি বাড়া চাই। আর এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, সকল ব্যাপারের সরল সম্পর্ক থেকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও জটিল সম্পর্ক বিচারের ক্ষমতাও তার হওয়া দরকার। বিনের আর একটি অভীক্ষা থেকে এই দুটিরই উদাহরণ পাওয়া যাবে ; তা হল ওজনের তুলনা। এই অভীক্ষাগুলি পাঁচ ও দশ বছরের জন্য নির্দ্দিষ্ট। প্রথমটির উপকরণ হল চারটি বাক্স ; বাক্সগুলি একই রকম দেখতে এবং সমান আকারের, প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ৩২, প্রস্থ ২২ ও স্থূলতা ১২ সেন্টিমিটার (এক সেন্টিমিটার অর্দ্ধ ইঞ্চির কিছু কম), অর্থাৎ ছোট দেশলাইয়ের বাক্সের আকার ; আর চারটির ওজন যথাক্রমে ৩,৬,১২ ও ১৫ গ্রাম (এক গ্রাম প্রায় এক তোলার বার ভাগের এক ভাগ)। শিশুকে একবার ৩ ও ১২ গ্রামের বাক্স দুটি, তার পরে ৬ ও ১৫ গ্রামের দুটি দেওয়া হয়, আর প্রত্যেকবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে, দুটি বাক্সের মধ্যে কোনটি বেশী ভারী। দশ বছরের ছেলের দ্বিতীয় অভীক্ষাটিতে পাঁচটি বাক্স লাগে, তাদের গঠন ও আকার পূর্ব্বের মত, কিন্তু ওজন যথাক্রমে ৩, ৬, ৯, ১২ এবং ১৫ গ্রাম। এই বাক্সগুলি শিশুকে দিয়ে

সেগুলি ওজন অনুসারে পর পর সাজাতে বলা হয়। এখানে দেখা গেল যে, দেখতে এক রকম অথচ ওজনে অনেকখানি তফাৎ, এরকম দুটি জিনিষের মধ্যে কোন্‌টি বেশী ভারী, পাঁচ বছরের একটি শিশু তা ঠিক বলতে পারে, কিন্তু পাঁচটি বিভিন্ন ওজনের সঠিক তুলনা করার শক্তি আসতে আরও পাঁচ বছর লাগে। শেষের ক্রিয়াটিতে জটিলতা খুব বেশী। কারণ পাঁচটি ওজনের তুলনা ত সে এক সঙ্গে করতে পারে না। প্রথমে সে যে কোনও দুটি নিয়ে তুলনা করে। তারপরে আর দুটি নেয়, আর প্রথম দুটির যে ধারণা তার মনে রয়েছে, তারই সঙ্গে হাতের দুটির বিষয় মিলিয়ে দেখে ; এই ভাবে তাকে চিন্তা ক'রে চলতে হয় সমগ্র পাঁচটির ওজন যা সে হাতে নিয়ে বুঝেছে. এবং সেগুলির পরস্পর তুলনা তাকে মনের মধ্যে রাখতে হয়েছে। সুতরাং এই অভীক্ষায় বিভিন্ন সম্পর্ক বা তুলনা মনে ক'রে রাখবার এবং সেগুলি সম্পূর্ণ আকারে পরস্পর সংযুক্ত করবার অনেক বেশী ক্ষমতা আবশ্যক।

শিশুদের চিন্তা ও বিচারশক্তির তুলনা করবার জন্য অধ্যাপক বার্ট অতি উৎকৃষ্ট যুক্তি অভীক্ষার (reasoning test) ক্রমোন্নত পর্য্যায় তালিকা বা মানদণ্ড রচনা করেছেন। বিনের বিবিধ রকমের অভীক্ষাগুলির চেয়ে এই সুনির্দ্দিষ্ট যুক্তি মানদণ্ডের সাহায্যে শিশুর চিন্তার সাধারণ বিকাশের ধারাটি আরও স্পষ্ট ও সার্থকভাবে দেখা যায়। এই অভীক্ষাবলী সাত বছরের কম বয়স থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলে মেয়েদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ও অসামান্য দক্ষতা ও বিচক্ষণতা সহকারে রচিত। আগ্রহশীল পাঠক এর সম্পূর্ণ বিবরণ পড়লে সুফল পাবেন। এখানে শুধু উপস্থিত বক্তব্যটি বুঝাবার জন্য তিন চারটির উল্লেখ করা যাবে, এগুলির মধ্যে কেবল নামের অতি সামান্য পরিবর্ত্তন আবশ্যকরূপে করা হয়েছে।

সাড়ে ছয় বছরের শিশু এগুলির অন্তর্গত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে

পারে : তারক, জীবনের চেয়ে জোরে দৌড়ায় ; যদু, জীবনের চেয়ে ধীরে দৌড়ায় ; তিনজনের মধ্যে কে সবচেয়ে ধীরে দৌড়ায় ? সাত বছর বয়সের প্রশ্ন : কমলা, মায়ার চেয়ে চালাক ; মায়া, যমুনার চেয়ে চালাক ; যমুনা, কমলা এবং মায়ার মধ্যে সব চেয়ে বেশী চালাক কে ? আট বছরের একটি মজার প্রশ্ন এইরূপ। বিপিনের টাকার থলি চুরি গেছে ; যে চুরি করেছে, সে কালো বা লম্বা নয়, গোঁফ দাড়ী কামানোও নয় ; সে সময়ে ঘরে তিনজন লোক ছিল—জগৎ, সে বেঁটে, কালো ও গোঁফ দাড়ী কামানো ; শ্যাম, ফরসা, বেঁটে ও তার দাড়ী আছে ; আর গগন, সে কালো, লম্বা কিন্তু গোঁফ দাড়ী কামানো নয়। এর মধ্যে কে বিপিনের টাকার থলি নিয়েছে ? নয় বছরের প্রশ্ন : তিনটি ছেলে এক সারিতে বসে আছে, হরি উমেশের বাঁ দিকে, আর জগৎ হরির বাঁ দিকে বসেছে ; কোন ছেলেটি মাঝখানে বসেছে ? দশ বছরের এক প্রশ্ন : আমি দক্ষিণ দিক থেকে আসছি, মালদহ যেতে হবে। আমার ডান দিকের রাস্তাটি অন্য স্থানে গেছে, সামনের দিকে রাস্তাটি এক ক্ষেতবাড়ীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। মালদহ কোন দিকে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব বা পশ্চিম ? বার বছর বয়সের এক চমৎকার প্রশ্ন হল এই। ক্ষেতের ইঁদুরেরা ভোমরাদের সঞ্চিত মধু খেয়ে ফেলে, অথচ এই মধুই ভোমরাগুলির প্রধান খাদ্য। সহরের নিকটে খোলা পল্লীর তুলনায় ঢের বেশী বিড়াল আছে। আর বিড়ালেরা সব রকমের ইঁদুর মেরে ফেলে। তা হ'লে কোথায় বেশী ভোমরা থাকে, সহরের নিকটে না উন্মুক্ত পল্লীতে ?

অধ্যাপক বার্টের এই যুক্তি অভীক্ষাগুলি সম্পর্কে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এগুলির বয়সের মান বিশেষ যত্নসহকারে সুনির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কোনও বয়সের অভীক্ষাটি সেই বয়সের অধিকাংশ শিশুই যে সমাধান করতে পারে, তা স্থিরীকৃত হয়েছে। এখন এগুলি

থেকে দুইটি গুরুতর কথা জানা যায়। প্রথমতঃ, পূর্ব্বে যে ধারণা ছিল যে, তের চৌদ্দ বছর বয়সে যুক্তির ক্ষমতার প্রথম উন্মেষ হয়, তা একেবারে ভুল। যদি বিচার্য্য তথ্যগুলি সংখ্যায় অল্প, সহজ, যথেষ্ট স্থূল ও পরিচিত হয়, তবে সাত বছরের কম বয়সের শিশুও উপযুক্ত ভাষায় যুক্তি প্রয়োগ করতে বেশ ভাল পারে। বার্ট তাঁর এসম্পর্কে গবেষণার ফল প্রথম প্রকাশ করবার সময়ে নিজেই লিখেছিলেন, "বিধিমত যুক্তি প্রয়োগ করার জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় সকল মানসিক ক্রিয়াশক্তিগুলিই ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিশুবিভাগ ত্যাগ করার সময়ে, অর্থাৎ মানসিক বয়স সাত বৎসরে বা তার কিছু পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকে।" তিনি আরও লিখেছেন, "যুক্তিক্ষমতার বিকাশের অর্থ প্রধানতঃ এই যে, এ ক্রিয়াশক্তি যে সব বিষয়ে প্রয়োগ করতে পারা যায়, সেগুলির আয়তন ও বৈচিত্র্য বেড়ে যায় আর ক্রিয়াশক্তিগুলির প্রয়োগও অধিক নির্ভুল ও বিস্তৃত হয়। প্রশ্নের কঠিনতা তার জটিলতার উপর নির্ভর করে।" তাঁর আর একটি উক্তি হচ্ছে, "বিষয়ের অন্তর্গত সম্পর্কগুলি কোন শ্রেণীর, স্থান বা অবস্থিতিমূলক, সংখ্যাবাচক বা কার্য্যকারণগত, এবং সেগুলির যোগসূত্রই বা কি, কাল্পনিক অথবা বিচ্ছিন্ন, যুক্তি প্রয়োগে এ সবের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প।" অর্থাৎ যদি শিশুর কোনও বয়সে দেখা যায় যে, হঠাৎ এক বিষয়ে যুক্তির ক্ষমতা তার নূতন আবির্ভূত হয়েছে, যেমন দূরত্ব, সময় বা কার্য্যকারণ সম্পর্কে, আর এ বিষয়ে 'যদি', 'তবে', ইত্যাদিরূপ সর্ত্তাধীন বিচার সে করতে পারছে, সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে ঠিক ভাবে লক্ষ্য না করার জন্য এই শক্তির প্রথম সূচনা আমাদের চোখে পড়ে নি; আর কেবল সেই কারণেই এর আবির্ভাব আমাদের আকস্মিক মনে হচ্ছে। সকল শ্রেণীর যুক্তির প্রশ্ন যদি যথেষ্ট সাদাসিধা ও স্পষ্ট

হয়, তবে সাত বছরের কম বয়সী শিশুরাও তার উত্তর দিতে পারবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর অধ্যাপনায় এই তথ্যসমূহের তাৎপর্য্য কি, পাঠক নিশ্চয় তা খানিকটা বুঝতে পারছেন। ছোটদের শিক্ষাদান প্রণালীতে এই কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান যে, খুব ক্ষুদ্র শিশুদেরও শুধু অভ্যাস ও স্মরণশক্তি দ্বারা চালিত জীব মনে করলে চলবে না। উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে তারাও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে, যুক্তি দেখাতে ও নিজ সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারে, সে কথা মনে রাখতে হবে।

তা হ'লেও অতি সরল অবস্থায় যুক্তির উৎপত্তি থেকে খুব ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটার ফলে, ছোট ও বড় শিশুর মধ্যে একটা মোটামুটি প্রভেদ থাকে। এরই একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এই যে, অন্যের যুক্তির বিচার করবার ও যুক্তিগত ভুল লক্ষ্য করবার শক্তি, সোজাসুজি গঠনমূলক যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতার চেয়ে বেশী বয়সে জন্মায়। বিনে ও বার্টের অভীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, এগার বছর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাভাবিক বুদ্ধির শিশু, যে অভীক্ষাপ্রশ্নে 'অসম্ভব' কি আছে বলে দিতে হয় (absurdity test), সেগুলি পারে না। যেমন, "একদিন একটি লোক সাইকেল থেকে মাথা নীচের দিকে করে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল, সেখানকার লোকেরা আশঙ্কা করছেন সে আর ভাল হবে না।" অথবা "আমার তিনটি ভাই আছে, জলদ, তরুণ ও আমি।" এগার বছর বয়স হ'লে তবে শিশু এই উক্তিগুলির অসম্ভাব্যতা লক্ষ্য করা এবং সেটি ঠিক ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া, এই দুটি কাজ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তার অর্থ অবশ্য এমন নয় যে, এর চেয়ে কম বয়সে শিশু যে কোনও শ্রেণীর

ও সহজ ধরণের অসম্ভব কথাও ধরতে পারবে না। যাঁরা শিক্ষা মনোবিদ্যার গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাঁরা যদি সাত বছরের কম বয়স্ক শিশুদের উপযোগী এই ধরণের অসম্ভব উক্তির অভীক্ষার ক্রমপর্য্যায়বদ্ধ মানদণ্ড গঠন করেন, তবে তা বড়ই মূল্যবান ও উপকারের জিনিষ হবে। বিনের মানদণ্ড সাত বছর বয়স থেকে আরম্ভ, তা পূর্ব্বে দেখা গেছে ; আরও এক সুপ্রসিদ্ধ অভীক্ষামালা ডাঃ ব্যালার্ড গঠন করেছেন ; তারও আরম্ভ এখানেই হয়েছে, আর কঠিনতার বৃদ্ধি ক্রমশঃ বেশী বয়সের দিকে উঠেছে। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এর চেয়ে অনেক কম বয়সের শিশুদের জন্যও এইরূপ, অবশ্য খুব সহজ রকমের, অভীক্ষা প্রস্তুত হতে পারে ; কারণ খুব ছোট শিশুরাও নিজে হতে যে সব কথা বলে, তা থেকে অনেক সময়ে বুঝা যায় যে সরল ব্যাপারে যুক্তির অসম্ভাব্যতা লক্ষ্য করবার শক্তি তাদের রয়েছে।

৫। শিশুদের ভুল

বিভিন্ন বয়সে শিশুর যুক্তির ক্ষমতা কেমন থাকে, সে সম্পর্কে মনোবিৎ বিনে এবং বার্টের আবিষ্কৃত তথ্য উপরে দেওয়া গেছে। এবারে অধ্যাপক পিয়াজে এ বিষয়ে কি বলেছেন, তাই দেখা যাক। তাঁর গবেষণার বিষয় হচ্ছে প্রধানতঃ শিশুদের ভুল। শিশু যে ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে না, সে ক্ষেত্রে সে কি করে, যখন সে প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে অক্ষম হয় তখন তার মনে কি ক্রিয়া চলতে থাকে, এই সব নিয়ে তিনি অনুসন্ধান করেছেন। পিয়াজে নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন যে, 'বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী আয়ত্ত করার পূর্ব্বে শিশুকে কিরূপ বাধা অতিক্রম করতে হয়', তাই দেখাবার তিনি চেষ্টা করেছেন। যেমন, আমরা আগে দেখেছি যে সাধারণতঃ শিশুর এগার বছর বয়স না হ'লে

সে ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারে না যে এমন এক উক্তিতে অসঙ্গত কি আছে, 'আমার তিনটি ভাই আছে, জলদ, তরুণ ও আমি।' এক্ষেত্রে পিয়াজে অনুসন্ধান করলেন যে এরূপ একটি প্রশ্ন দিলে শিশু ঠিক কি করে, যার ফলে তার যুক্তি প্রয়োগে ত্রুটি হয়, আর উত্তরও ভুল হয়।

এই ধরণের বহু গবেষণায় পিয়াজে অতি সুনিপুণ পদ্ধতিতে পরীক্ষা ও প্রশ্ন প্রয়োগ ক'রে দেখেছেন। এবং তারই ফলে এগার বার বছর বয়স হওয়ার পূর্ব্বে নানা বয়সী শিশুর মনে জগৎ সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা চলতে থাকে, তারই স্বরূপ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে অতি মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক তথ্যাবলী তিনি সংগ্রহ করেন। এখানে আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর কয়েকটি সিদ্ধান্তেরই মাত্র উল্লেখ করা যাবে।

এই 'তিন ভাই'এর অভীক্ষাটি নিয়েই আরম্ভ করা যাক। পিয়াজে তাঁর পরীক্ষায় একজন শিশুকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। এতে অসম্ভব কি আছে শিশু ধরতে পারল না; তখন তিনি তাকে বাক্যটি এমনভাবে সাজাতে বললেন যে তার মধ্যে যেন কিছু 'বোকামী' না থাকে। এবং সেই সঙ্গে সাধারণভাবে পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শিশুর মনে কিরূপ ধারণা আছে, তা জানবার জন্যও নানারূপ প্রশ্ন করলেন। এইভাবে তিনি বার করলেন যে, শিশুদের না পারার প্রধান কারণ এই যে তারা এখনও ব্যতিহার বা পারস্পরিক সম্পর্কের (reciprocal relation) ব্যাপার ভাবতে বা বুঝতে পারে না। অর্থাৎ তাদের ভাই সম্পর্কে তাদের কি হয়, সে কথা তারা সহজেই বুঝে; কিন্তু যখন বলা হয় যে তারা তাদের ভাই বা অন্য কোনও আত্মীয়ের কি হয়, তখন তা এত স্বাভাবিকভাবে তাদের মনে আসে না। নিজের ভাই 'থাকা' কি ব্যাপার শিশু তা বুঝে; কিন্তু নিজে ভাই 'হওয়া' যে কি, সে কথা সে বুঝতে পারে না। সে দেখতে

পায় না যে, পরিবারের প্রত্যেকেরই অন্য সকলের সঙ্গে ভাই বা বোন বা এমনই কিছু একটা সম্পর্ক রয়েছে, আর সবাই প্রত্যেককে 'আমার ভাই (বা অমুক আত্মীয়)' ব'লে অভিহিত করতে পারে। এক কথায়, সমগ্র পরিবারের অন্তর্গত অংশগুলির পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞান তার নেই। তাই মাতাপিতা ও সন্তানের পারস্পরিক সম্পর্কটির বেলায়ও তার এইরূপ ভুল হয়।

এরই দৃষ্টান্তস্বরূপ পিয়াজে বর্ণিত এক আট বছরের ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। এতে দেখা যাবে যে, প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গিয়ে শিশুটি এই সব সম্পর্কের ব্যাপার বুঝতে কি রকম হয়রাণ হচ্ছে। শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "তোমার কি ভাই আছে?" সে বললে, "হাঁ"। "আর তোমার যে ভাই, তার কি ভাই আছে? "না"। "তুমি ঠিক জান কি?" "হাঁ"। "তোমার বোনের কি ভাই আছে?" "না"! "তোমার বোন আছে কি?" "হাঁ"। "আর তার ত ভাই আছে?" "হাঁ"। "কয়টি?" "না, তার একটিও ভাই নেই!" "কিন্তু তোমার ভাই তোমার বোনেরও ত ভাই?" "না"। "আর তোমার ভাইয়ের কি বোন আছে?" "না।" "তোমাদের পরিবারে কটি ভাই আছে?" "একটি।" "তবে তুমি নিজে ভাই নও?" এতে শিশু হেসে বলে, "হাঁ"। "তবে তোমার ভাইয়েরও ত ভাই আছে?" "হাঁ"। "কয়টি?" "একটি।" "সে কে?" "আমি।"

এই উদাহরণ থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, একটা নির্দ্দিষ্ট মানসিক বয়সের আগে শিশুর পক্ষে তার ভাই ও তার মধ্যে পরস্পর সম্পর্কটি তার ভাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে কি, সে কথা বুঝা কতখানি কঠিন। শিশুর বিচার এইরূপ চরম (absolute) বিচার, তার মধ্যে তুলনা বা আপেক্ষিক (relative) জ্ঞান নেই। নিজেকেই সে সবের কেন্দ্রস্বরূপ

দেখে, সেইজন্য বস্তুসমূহের অবস্থিতির আপেক্ষিক তুলনাযুক্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর সে দিতে পারে না। যেমন, বার্টের যুক্তি অভীক্ষার এই প্রশ্ন, "তিনটি ছেলে এক সারিতে বসে আছে। হরি উমেশের বাঁ দিকে, আর জগৎ হরির বাঁ দিকে বসেছে। কোন ছেলেটি মাঝখানে বসেছে?" নয় বছর বয়স না হ'লে সচরাচর শিশু এর সমাধান করতে সক্ষম হয় না। পিয়াজে এই প্রশ্নটি আরও কম বয়সী শিশুদের উঁপর প্রয়োগ ক'রে দেখে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, তারা মনে মনে ডান দিক ও বাঁ দিকের পরস্পর আপেক্ষিক সম্পর্কটি বিচার করতে পারে না ব'লেই এই প্রশ্ন তাদের পক্ষে কঠিন হয়।

শিশুদের যুক্তি সম্বন্ধে পিয়াজে এই রকম অনেক বিস্তারিত গবেষণা করেন। তা থেকে তিনি শিশুর চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশে যে পর পর কয়েকটি পর্য্যায় আসে, আর বিভিন্ন বয়সে তাদের সামাজিক বোধের পরিণতি, তাদের যুক্তি ও চিন্তার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, সে বিষয়ে কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

পিয়াজে বলেন যে সাত আট বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর সামাজিক এবং বুদ্ধিগত বিকাশের এক স্থূল ও সাধারণ অবস্থা দেখা যায়, তাকে তিনি আত্মকেন্দ্রিকতা (egocentricity) নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এই পর্য্যায়ে শিশুরা শুধু তাদের আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক আচরণে নয়, সমুদয় সামাজিক চিন্তায়ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। নিজেদের ধারণার উপর তাদের গভীর বিশ্বাস থাকে, এবং তারা ধরে নেয় যে আর সকলের বিশ্বাসও ঠিক সেই রকম। জগতের ব্যাপার সম্বন্ধে তাদের অভিমত অন্যের সঙ্গে আলোচনা পরামর্শ ক'রে গঠিত হয় না। পিয়াজে বলেন যে তারা আসলে অন্যের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে আলোচনা বা তর্কই করে না। তারা শুধু এইটুকু বুঝে যে,

অপরের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নরূপ হতে পারে, এবং তারই দ্বারা তাদের নিজেদের মত বদলাবারও প্রয়োজন হতে পারে। এই বয়সের একদল ছেলেমেয়ে একত্র হ'লে তাদের অবশ্য খুব কথাবার্ত্তা হয় বটে ; কিন্তু সে সব কথার উত্তর দেবার কিছু থাকে না, তর্ক হওয়া ত দূরের কথা। তাদের কথায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ভাব প্রকাশ পায়, তাকে সুসংলগ্ন আলাপ বলা চলে না। তাদের প্রশ্নগুলিও স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ সেগুলির উত্তর দেবার প্রয়োজন থাকে না ; জোর করে কিছু বলা বা তর্ক করাই তার অভিপ্রায়, জিজ্ঞাসা তার উদ্দেশ্য নয়।

সুতরাং পিয়াজের মতে শিশুরা তাদের ছেলেমানুষী ধরনে নির্ব্বিচারে ধরে নেয় যে, তারা জগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখেছে, জগতের আসল রূপই তাই ; আর এই জন্যই ভাষাগত বা কথার যুক্তিতে তাদের অক্ষমতা থাকে। যতদিন না শিশুর এই জ্ঞান হয় যে, তার মতের বিপরীত মত ও থাকতে পারে, এবং অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে সব জিনিষ ভিন্নরূপ দেখাতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত সে নিজে কিরূপে চিন্তা করছে তা বিচার ক'রে দেখবার ঝোঁক তার হয় না। আর এটি না হ'লে সে যুক্তি সহকারে চিন্তা করতেও শেখে না।

পিয়াজে তাঁর সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখেছেন যে, এই ছোট বয়সের শিশুরা 'যেহেতু' এবং 'সুতরাং' বিশিষ্ট কার্য্যকারণ সম্পর্কের যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। যে কথাগুলি পরস্পর সম্বন্ধহীন বা বিপরীত, সেগুলি তারা মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে পৃথক রাখতে পারে না, সব তাল পাকিয়ে ফেলে ; আর যেখানে "কিন্তু" বা "কারণ" হবে, সেখানে "এবং" ধরে। কার্য্যকারণ সম্পর্ক সচরাচর তারা উল্টো ক'রে ফেলে, আর অনেক বয়স্কদের মত তারা সাধারণ নিয়মটি না ধ'রেই এক দৃষ্টান্তের যুক্তি অন্য দৃষ্টান্তে লাগায়।

পিয়াজে বলেন যে সাত আট বছর বয়সে শিশুর সামাজিক প্রবৃত্তির বিকাশ আরম্ভ হয়। কম বয়সে যেমন সে দলের মধ্যে থাকলেও খেলা অনেকটা তার নিজেরই, এ বয়সে তেমনই অন্য সকলের সঙ্গে মিলে খেলার ঝোঁক তার বাড়ে, সুতরাং সঙ্গীদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধেও তার বোধ জন্মায়। সে ক্রমে বুঝে যে, তাদের ধারণা অনেক বিষয়ে ভিন্ন হ'তে পারে ; এবং সাধারণতঃ যা সত্য, যেমন বস্তুর অবস্থিতি (উত্তর দক্ষিণ ইত্যাদি), তার সত্যতা যেদিক থেকে বিচার করা হচ্ছে, তারই উপরে আপেক্ষিকভাবে নির্ভর করে। অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে শেখার সঙ্গে ক্রমশঃ সে পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝে চিন্তা করতে এবং সাধারণ যুক্তির মানে নিজের ক্রিয়া বিচার ক'রে দেখতেও পারে।

কিন্তু কার্য্যকরী যুক্তির তুলনায় তার ভাষার সাহায্যে চিন্তা করার ক্ষমতা অনেকখানি পিছিয়ে থাকে। ডান ও বাঁ দিক, পরিমাণ ও অবস্থিতি, সামাজিক সম্পর্ক, ইত্যাদির ব্যবহারিক জ্ঞান তার অনেক আগে হয় ; কিন্তু এগুলি ভাষায় বা ক্রিয়াবর্জ্জিত চিন্তায় প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেরীতে আসে। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার সারা বয়সটি ধ'রেই এই সব ব্যাপারের সমাধান সে হাতে কলমে সহজেই করতে পারে, কিন্তু এই বয়সের শেষ, অর্থাৎ এগার বছরের পূর্ব্বে ভাষাগত চিন্তার সূচনা দেখা যায় না। যান্ত্রিক স্থূল ক্রিয়ার কার্য্যকারণ সে আট নয় বছরেই ধরতে পারে, কিন্তু কার্য্যকারণ সম্পর্কিত ধারণা চিন্তায় প্রয়োগ করার ক্ষমতা এগার বার বছর বয়সের আগে হয় না।

শিশুর আচরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁরই আছে, তিনিই তার যুক্তি ও বিচারশক্তির উন্মেষ সম্পর্কে এই সাধারণ সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে একমত হবেন। এই ব্যাপার আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে, ছোট

শিশু তার উপস্থিত আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীতেই প্রধানতঃ জগৎকে দেখে, আর নিজের সম্পর্কে সব জিনিষ বিচার করে। অন্য লোকের সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে তার এই আত্মকেন্দ্রিক ভাব দূর হয়, এবং সে পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝতে শেখে। আমরা এ ও দেখতে পাই যে তার সামাজিক সম্পর্কবোধের ক্রমপরিণতি তার এই বিষয়ে নিজ ভাব ভাষায় প্রকাশ করা এবং স্পষ্টতা ও সামঞ্জস্য সহকারে চিন্তা করার বিষয়ে প্রবল প্রেরণা দেয়। শিশুদের সামাজিক ও বুদ্ধিগত বিকাশের বিবিধ ব্যাপার যে ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত, তা পিয়াজে খুব সুন্দরভাবে সব দিক থেকে দেখিয়েছেন।

কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। পিয়াজের প্রদত্ত তথ্য থেকে যেন আমাদের এই ধারণা না হয় যে, শিশুগণের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন পর্য্যায়গুলি স্বতন্ত্র, পৃথক ও নির্দ্দিষ্ট সীমাযুক্ত। এমন সিদ্ধান্ত ভুল; এ ধারণা আমাদের দেওয়া পিয়াজের উদ্দেশ্য নয়, আর সাধারণ ছেলেমেয়েদের প্রতিদিনকার পরিচিত ক্রিয়া আচরণ লক্ষ্য করলেও তা সমর্থিত হয় না। বাস্তব ক্ষেত্রে শিশুদের বিকাশে এই বিভিন্ন পর্য্যায় পরস্পর জড়িয়ে ও মিলে যায়। কোনও শিশু হয় ত সাময়িক খেয়াল ও সামনের পরিস্থিতি অনুসারে, এক ব্যাপারে যৌক্তিক-ভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হয়, অথচ অন্য আর এক ক্ষেত্রে তার স্বপ্ন, কল্পনা বা অলৌকিক ধারণার প্রভাব এসে পড়ে।

অধ্যাপক বার্ট দেখিয়েছেন যে, সাত আট বছরের ক্ষুদ্র শিশুরাও অনেকে যুক্তিপ্রয়োগ করতে পারে, এবং তা শুধু হাতে কলমেই নয়, যে সমস্যা বেশ সহজ, প্রত্যক্ষ ও পরিচিত, সেক্ষেত্রে ভাষায়ও যুক্তি দিতে পারে। সকল জননীই জানেন যে, খুব ছোট ছেলেমেয়েও প্রায়ই জানতে চায় কি ভাবে কোনও ঘটনা ঘটছে, কি কারণে কি ফল হচ্ছে, তবে

স্পষ্ট যুক্তিসহকারে তা প্রকাশ করতে বা ঠিক বুঝতেও পারে না। ছোটরা যখন নিজেদের মধ্যে অবাধে কথা কয়, তা শুনলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে খুব ছোট বয়সেই তাদের আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে আলাপ ও পরস্পর মত বিনিময়ের কিছু চেষ্টা অন্ততঃ প্রায়ই দেখা যায় ; আলোচনা অবশ্য খুব সুসংলগ্ন হয় না, তা আমরা আগে লক্ষ্য করেছি। সুতরাং বয়ঃপর্য্যায়গুলির মধ্যে যে প্রভেদ, তা সচরাচর পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নয়। এইজন্য ছোট শিশুর বিচারবুদ্ধিতে আত্মকেন্দ্রিকতার দোষ বড় শিশুর তুলনায় অধিক দেখা যায় বটে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষেরও এই ত্রুটি মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

৬। যুক্তির উন্মেষ

এখন শিশুর চিন্তা সম্বন্ধে ডাঃ সুজান আইজাক্‌সের নিজের গবেষণার আলোচনা করা যাক, আর তার সঙ্গে পিয়াজের প্রাপ্ত তথ্যসমূহ তুলনা করে দেখা যাবে। তাঁর এই গবেষণা প্রধানতঃ আট বছরের নীচের বয়সী শিশুদের নিয়ে ; কিন্তু শিশুগুলি অসাধারণ মেধাবী, তাদের গড় বুদ্ধির অঙ্ক ১৩১। সুতরাং এই থেকে সাধারণবুদ্ধির আরও বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের চিন্তাপ্রণালীর উপরেও যথেষ্ট আলোকপাত হবে। তাঁর যে সাধারণ তথ্যগুলি সাত থেকে এগার বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে প্রযোজ্য, সেগুলির কথাই বিশেষভাবে বলা যাচ্ছে।

কিরূপ সাধারণ পরিবেশে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল, তাও প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার, কারণ তার সঙ্গে পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তসমূহের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে। যে পরিবেশে এই শিশুগুলি বাস ক'রত, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তার মধ্যে শিশুর স্বকীয় ক্রিয়া ও চিন্তা উৎসাহ পেত। বাইরের ব্যবস্থা ও শিক্ষার পদ্ধতি এমনভাবে

পরিকল্পিত হ'য়েছিল যে তাতে শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থীর ক্রিয়ার সুযোগই ছিল বেশী। শিক্ষকেরা একপাশে সরে থেকে, শুধু প্রয়োজন বোধ ক'রলে উপদেশাদি দিতেন; কিন্তু প্রধানতঃ শিশুগুলির স্বতঃস্ফূর্ত্ত আগ্রহের অনুসরণ করা, এবং সকল বিষয়েই তাদের জিজ্ঞাসা, পরীক্ষা, আবিষ্কার, ইত্যাদিকে উৎসাহ দেওয়াই ছিল তাঁদের কাজ। যেমন প্রাকৃতিক জগতে কার্য্যকারণ সম্পর্কে বুঝবার আগ্রহের সামান্যমাত্র সূচনা হ'লেও তার উপযোগী সুযোগ দেওয়া হ'ত। এর দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে। শিশুগুলি দৈবাৎ আবিষ্কার ক'রল যে খেলনা গড়বার এক টুকরা মোম গরম জলের নলের উপর পড়ে গ'লে গেছে। এই নিয়ে তাদের মধ্যে খুব চাঞ্চল্য দেখা গেল; তারা আরও নানাবিধ বস্তু, প্ল্যাস্টিসিন, খড়ি, কাঠ, ইত্যাদি সেই গরম নলের উপরে রেখে গলে কি না দেখতে লাগল। এই নিয়ে আলোচনা হ'ল প্রচুর, তার ফলে জিনিষগুলি আগুনে আরও ভাল গলে কি না, সেই জল্পনা হ'ল। আর শিশুগুলি বাগানে গিয়ে এই সব নানা বস্তু আগুনে ফেলে কি হয় পরীক্ষা করতে লেগে গেল। তাদের এই নূতন আগ্রহের সূত্র ধরে, যাতে এই সমস্ত পরীক্ষা সহজে হয়, আর তার ফল তারা স্পষ্টরূপে পর্য্যবেক্ষণ করতে পারে, সেই জন্য তাদের বাতি ও তার সরঞ্জামও দেওয়া হ'ল। তাদের এই রকম আর একটি সখ হ'ল বরফ গলান; সেবারই শীতের এক সকালে তুষারপাতের সময়ে এর সূত্রপাত হ'ল, এবং গরম নলে বরফ ভরা পাত্র রেখে প্রথমে পরীক্ষা চল্‌ল।

এমনই আর একবার কতকগুলি ছেলেমেয়ে কপি বা দড়ি লাগান চাকা (pulleys) চালান দেখেছিল। তারা বার ক'রল যে; এগুলিতে ভারী ওজন সংযুক্ত থাকে, তারই সাহায্যে আলো ও অন্যান্য জিনিষ উপরে উঠান এবং নামান হয়। এর পর শীঘ্রই তাদের এই রকম কপি

দেওয়া হ'ল, আর খেলায় সেগুলি ব্যবহার ক'রে তারা সে যন্ত্রের ক্রিয়া হাতে কলমে বুঝে নিল।

এ ছাড়া জিনিষ গড়া, অভিনয়, নাচ গান আর মন-গড়া কল্পনার খেলাতেও তাদের উৎসাহ ও সর্ব্ববিধ সুযোগ দেওয়া হ'ত, ঠিক উপরে বর্ণিত জল ও আগুনের ব্যাপারের মত। তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতির একটা আবশ্যিক অঙ্গই ছিল এই যে, তাদের ইচ্ছামত বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা অথবা তাদের স্বপ্ন কল্পনাগুলিকে প্রকাশ করার তারা অবাধ স্বাধীনতা পেত। এদের জীবনযাত্রার আর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের কথা বলবার স্বাধীনতা। তাদের যা কিছু মনে আসত তা বলবার, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার, তর্ক করবার, অবাধ সুযোগ তাদের সব সময়ে থাকত। নিজেদের চিন্তা ও অনুভূতি ব্যক্ত করবার এই সুযোগ যে তাদের ভাষাগত যুক্তির ক্ষমতা ও বাইরের বস্তুজগৎ সম্বন্ধে কৌতূহল, উভয়কেই বাড়িয়ে তুলেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই ভাবে সব রকমের কার্য্যকরী ব্যাপারের বিষয়ে উৎসাহ পাওয়ার স্বাভাবিক ফল এই হ'য়েছিল যে, তাদের বয়সী বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ের তুলনায় তাদের ব্যবহারিক বিচারবোধ বেশী গভীর এবং সূক্ষ্ম হ'য়ে উঠেছিল। এই জন্য তাদের খেলা এবং জিনিষ গড়ার কার্য্যকরী সমস্যার মধ্যে যে সব প্রাকৃতিক কার্য্যকারণ সম্পর্কের ব্যাপার থাকত, সে বিষয়ে তাদের প্রচুর আগ্রহ দেখতে পাওয়া যেত। বিভিন্ন শিশুর বেলায় এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই কৌতূহলের পরিমাণেরও তারতম্য ঘ'টত। কিন্তু তাদের সকলের মধ্যেই এই গুণের পরিচয় পাওয়া যেত, সম্ভবতঃ এই বয়সের সমস্ত বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের মধ্যেই এই গুণটি বিদ্যমান থাকে।

আরও দেখা গেল যে, শিশুগুলি কোনও যান্ত্রিক কার্য্যকারণ সম্পর্কের ব্যাপার থাকলে সেটি বুঝতে এবং কথায় বুঝিয়ে দিতে পারে। নীচে যে শিশুগুলির বিবরণ দেওয়া হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের আসল বয়স কত বছর কত মাস, তাও বন্ধনীমধ্যে উল্লেখ করা যাচ্ছে ; এগুলি ভাল ক'রে লক্ষ্য করা আবশ্যক।

একবার কয়েকটি শিশু বিদ্যালয়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পিছনে পড়ে গেল, তারা বললে যে সিঁড়িটি বড় খাড়া। সে কথা শুনে একটি ছেলে (৫ বছর ১ মাস) এই মন্তব্য করল, "হাঁ, তার কারণ সিঁড়ির নীচে বেশী জায়গা নেই। অনেকটা জায়গা থাকলে আমরা নীচের ধাপগুলি ঠেলে দিতে পারতুম, তাহ'লে সিঁড়িও এত খাড়া থাকত না।"

আর একটি ছেলের (৫ বছর ৯ মাস) উদাহরণ দেওয়া যাক। সে বাগানের মধ্যে তার ট্রাইসাইকেল চ'ড়ে বিপরীতদিকে পাদানী ঘোরাচ্ছে। তাই দেখে কোন বয়স্কা মহিলা তাকে বলেন, "কই, তুমি ত এগোচ্ছ না ?" সে বললে, "না, তা ত নয়ই, আমি যে উল্টোদিকে ঘোরাচ্ছি।" মহিলাটি জিজ্ঞাসা করেন, "তা হ'লে সামনে যায় কি ক'রে ?" সে তাঁর এই অজ্ঞতায় যেন মহা অবজ্ঞার স্বরে উত্তর দিলে, "কেন, পা দিয়ে পাদানী ঠেলে ঘোরাতে হয়, পাদানী আবার ঐ জিনিষটিকে ঘোরায়", এখানে সে একটি অংশ দেখিয়ে দিলে ; "তা আবার চেনটিকে ঘোরায়, চেন চাকার মধ্যে ঐটিকে ঘোরায়, এইভাবে চাকাগুলিও ঘোরে ; বাস্, হ'য়ে গেল।"

আর একটি ঘটনা বলি। দুটি শিশু কাগজের ঠোঙা তৈরী ক'রতে চায়, ঠোঙা ক'রে সেগুলি ফাটাবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "কি ক'রে তৈরী ক'রবে ?" একজন উত্তর দিলে, "ঠোঙাগুলি সেলাই ক'রে নেব।" আর একটি ছেলে (৫ বছর ১১ মাস) তখনই ব'লে উঠল, "না

তাতে হবে না। সে ঠোঙা ফাটবেই না, কারণ সেলাইয়ের ফুটো থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাবে।"

একবার একটি শিশু (৫ বছর ২ মাস) ব্যাখ্যা করা কাকে বলে তা বোঝাতে গিয়ে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে বলেছিল, "কোনও কিছু ব্যাখ্যা করা মানে, সেটি আর কোন জিনিষের মত, তাই বলা।"

এই শিশুদের মধ্যে পরস্পর সহজ ভাববিনিময় কতখানি চ'লত উপরের উদাহরণগুলিতে তারও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনবরত বহু আলোচনা, তর্ক, সংশোধন, ইত্যাদি হ'ত। একদিন তারা রেলগাড়ীর লাইন তৈয়ারী ক'রতে বসেছে ; সে সময়ে একটি ছেলে (৫ বছর ৩ মাস) আর একজনের লাইনটির ভুল ঠিক ক'রে দিয়ে ব'লে দিলে, "কাঠগুলি সব সময়ে লাইনের নীচে থাকে !"

এ কথা আগেই বলা হ'য়েছে যে, ছোট ও বড় শিশুদের যুক্তিশক্তির পার্থক্য অনেকখানি নির্ভর করে, প্রশ্নটিতে কল্পনা বা আনুমানিক 'যদি'র স্থান কতখানি আছে, তার উপর। এগার বা বার বছরের ছেলে বুদ্ধিমান হ'লে অনেক ব্যাপারের সিদ্ধান্ত মনে মনেই ক'রে নেয়, হাতে কলমে ক'রে দেখবার দরকার হয় না। অল্প বয়সে শিশুর এই ক্ষমতা কম থাকে। তার কল্পনা ও গঠনমূলক খেলার মধ্যে প্রথমে আমরা এই শক্তির পূর্ব্বাভাস দেখতে পাই। তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। এক আগন্তুক মহিলা শিশুদের কাছে তাঁর সমুদ্রপথে অস্ট্রেলিয়া থেকে আসার কাহিনী বর্ণনা ক'রছিলেন। যখন তারা শুনল যে তাঁকে কয়েক সপ্তাহ জাহাজে থাকতে হয়েছিল, তখনই একটি ছেলে (৪ বছর ১ মাস) বল্‌লে "তবে ত নিশ্চয় জাহাজে বিছানা লেগেছে।" এবং তার পরে অন্য শিশুরাও জাহাজে ভোজন ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে বেশ যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য ক'রতে লাগল্‌।

আর একটি ঘটনায় একবার শিশুদের খেলার দোলনাটি রং করাবার দরকার হয়েছিল। তাদের একজন চায় যে তখনই রং লাগান হোক ; তাই তাকে বুঝিয়ে বলা হ'ল যে সেদিন লাগালে রং শুকান পর্য্যন্ত কয়েকদিন তারা আর দোলনা ব্যবহার ক'রতে পারবে না। তখন একটি ছেলে (৫ বছর ২ মাস) এই বিধান দিলে, "তার চেয়ে যেদিন ছুটি হবে সেদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ভাল, তাহ'লে সারা ছুটি রং শুকাতে পারবে।"

শিশুদের যুক্তির এই সব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায় কেমন ভাবে শিশুর চিন্তা ও যুক্তি নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে পৌছায়। কার্য্যকরী ব্যাপারে তার যে আগ্রহ রয়েছে, তারই সাহায্যে তার ক্রিয়া অভিজ্ঞতা প্রথমে সরল ও সাধারণ পর্য্যায় থেকে ক্রমেই জটিল ও সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে। বহির্জগতের কার্য্যকারণ সম্পর্কে বাস্তবজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে তার চিন্তার মধ্যেও ক্রমশঃ সংযম আসে। আমরা এমন ঘটনাও দেখতে পাই যে, কোনও শিশু একই বয়সে কখনও নিছক কল্পনা আর অলৌকিক ইচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হচ্ছে, আবার পরক্ষণেই সে বাহির জগতের যৌক্তিক ও বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞান দেখাচ্ছে ; সাময়িক খেয়াল ও অবস্থা অনুযায়ী সে একবার অলৌকিক ধারণার দিকে, আর একবার বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকছে। যে শিশু নিরপেক্ষ যুক্তি ও কার্য্যকারণ সম্পর্ক বোধের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছে, তারই আবার মাঝে মাঝে নিছক আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা এবং অলৌকিক বিশ্বাসের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

একদিকে সাধারণবুদ্ধি ও কার্য্যকারণ সম্পর্ক জ্ঞান, অন্যদিকে আত্ম-কেন্দ্রিক স্বপ্ন কল্পনা, এই সংমিশ্রন এই বয়সের শিশুর মধ্যে এবং আরও বেশী বয়সের শিশুতেও দেখা যায়। এটি লক্ষ্য ক'রতে হ'লে শুধু

পরীক্ষার মধ্যে নয়, বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাদের সমস্ত ক্রিয়াই ভাল ক'রে দেখতে হয়। শুধু শিশু কেন, বড়দের মধ্যেও কি এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই না? তাঁদের মধ্যে খুব প্রকৃতিস্থ এবং স্থিরবুদ্ধি যাঁরা, তাঁদেরও মাঝে মাঝে সাধারণবুদ্ধি, যৌক্তিকতা ও বিচারশক্তির যথেষ্ট অভাব দেখা যায়; তার সঙ্গে শুধু শিশু ও আদিম মানুষদের অলৌকিক বিশ্বাসেরই তুলনা করা চলে। তাঁদের নানা বদ্ধমূল বিশ্বাস ও অভ্যস্ত আচার ও ক্রিয়ার মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়; আর অতি সুসভ্য মানুষেরাও যে কতকগুলি কুসংস্কারাশ্রিত পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানের মোহ থেকে আজও মুক্ত হ'তে পারেন নি, তা থেকেও এরই দৃষ্টান্ত মেলে।

ছোট শিশুরা যে কেবল বৈজ্ঞানিক ও অলৌকিক এই উভয় দৃষ্টির পরিচয় দেয়, তা নয়। ঘটনার চাপে কিংবা অন্য কারও কথা শুনে তাদের এমন যুক্তিহীন, অলৌকিক সংস্কার বদ্‌লে কিভাবে যুক্তিসঙ্গত বা বৈজ্ঞানিক ধারণায় পরিণত হয়, তার পরিচয়ও আমরা পাই। তারক ছেলেটি (৪ বছর ২ মাস) এক হাঁসের মত জীব তৈয়ারী করেছে এবং সেটি উঁচু ক'রে নাড়তে নাড়তে বলছে, "হাঁস উড়ছে।" একজন বললে, "এ হাঁস কি ক'রে উড়বে, এর ত ডানা নেই।" তাতে প্রথমে সে উত্তর দিলে, "ডানা এর ভিতরে আছে।" কিন্তু একটু পরেই সে তার ডানা গড়তে লেগে গেল। শিশুটির যে অপরের সংশোধন গ্রহণ করবার এবং তার দ্বারা নিজের আত্মকেন্দ্রিক ধারণা পরিবর্ত্তন করবার ইচ্ছা আছে, এই থেকে তা দেখা যায়।

এই ছেলেটিরই আর একটি ঘটনা বলা যাচ্ছে। পূর্ব্বে মনোবিজ্ঞানী পিয়াজে বর্ণিত শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তরের আলোচনায় আমরা দেখেছিলুম যে ক্ষুদ্র শিশু পারস্পরিক সম্পর্ক (reciprocal relation) ততটা বুঝতে পারে না, এ কথা সত্য। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে

এ শক্তির প্রথম আভাস খুব কম বয়সেই দেখা যায়, এই ঘটনাটি থেকে তা বুঝা যাবে। উপরের তারক ছেলেটি যখন আরও ছোট (২ বছর ১১ মাস), তখন সে একদিন সমবয়সী কজনের সঙ্গে খেলা করছিল, খেলাটি ছিল প্রত্যেক ছেলে পালা ক'রে এক একবার জানালা খুলবে। খেলতে খেলতে একটি শিশু বললে, "তারকের পরে আমি।" তা শুনে তারক নিজেও ব'লে উঠল, "তারকের পর আমি।" বলেই কিন্তু সে বুঝতে পারলে যে এটি অসম্ভব কথা ; তখন সে অন্যকেও সে কথা ব'লে দিলে, আর হাসতে হাসতে বার বার বলতে লাগল, "আমি বলেছি 'তারকের পরে আমি'!" এক্ষেত্রে সে একটু বুঝতে পারছে যে তার দৃষ্টিভঙ্গী তার নিজের পক্ষে যা, অপরের কাছে তাই নয় ; এবং এই বোধ থেকে পরে পারস্পরিক সম্পর্কের জ্ঞান হয়। যুক্তিগত অসম্ভাব্যতার বোধও এই থেকেই জাগে।

এই শিশুগুলি অবশ্য একটি বিশেষ শিক্ষা ও আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ হচ্ছে। কিন্তু এরা ছাড়াও, যেখানেই ছোটরা একসঙ্গে মিলে খেলে, সেখানেই প্রতিপদে দেখা যাবে যে, বাস্তব জ্ঞান ও যুক্তির প্রভাব তাদের কল্পিত খেলার সঙ্গে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্যে মিশে আছে। ছয় সাত বছরের শিশুদের একটি খুব মনের মত খেলা হচ্ছে, 'বিদ্যালয়' খেলা। বিশেষতঃ যে বাড়ীতে পড়াশুনার চর্চ্চা ও উৎসাহ আছে, ছেলেমেয়েরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় আর বিদ্যালয়জীবন সম্বন্ধে তাদের গল্প আলোচনা হয়, সেখানে এই খেলার আদর খুব। এই খেলায় দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ের বিবিধ কর্ম্মসূচী বহুক্ষণ ধ'রে অদম্য নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার সঙ্গে অনুসরণ করা হচ্ছে ; নাম ডাকা, পড়া বুঝান ও জিজ্ঞাসা করা, বোর্ডে অঙ্ক কসা, খাতা দেখা, ঘণ্টা বাজান, সবই আছে। তার সঙ্গে শাসনও অবশ্য র'য়েছে, তবে তা অল্প তিরস্কার পর্য্যন্ত ; এটি বোধ

হয় সকলের সম্মতি দ্বারা স্থির ক'রে নেওয়া হ'য়েছে, কারণ নইলে খেলা চলবে না। খেলার মধ্যে যারা আছে, তাদের কারও কারও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ও এখনও হয় নি ; শুধু একটু বড় সঙ্গীদের গল্প আর বর্ণনা শুনেই বিদ্যালয়ের সকল ব্যাপার তারা এমনভাবে চালিয়ে যাচ্ছে যে, আসল অভিজ্ঞতার তুলনায় তা কিছু কম মনে হয় না। এই খেলার এক অতি প্রিয় অঙ্গ হচ্ছে, 'নাম ডাকা'। জগতের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ যতই নিবিড় হয়, সত্যকার নূতন নূতন নামের নাটকীয় আকর্ষণও শিশুর মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সাড়া জাগায়। একটি সাত বছরের শিশু একটি বড় খাতা সামনে রেখে অনর্গল নাম ডেকে চলেছে ; প্রত্যেকটি কল্পিত, কিন্তু সেগুলিতে আজগুবী, অবাস্তব বা নাম পদবী যোজনার ভুল কিছু নেই বা পুনরাবৃত্তিও হচ্ছে না। এতটুকু বয়সে এইভাবে পর পর সুসঙ্গত সম্পূর্ণ নামগুলি মুখে মুখে রচনা ক'রে যাওয়া যে যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক, তা সকলেই বুঝতে পারবেন। কখনও হয়ত অন্য সঙ্গীরা এসে পড়েনি, তখন 'শিক্ষয়িত্রী' শুধু নাম ডেকে যাচ্ছেন, আর একই 'ছাত্রী' একা সকলের হ'য়ে 'উপস্থিত' সাড়া দিয়ে চলেছে। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ শিক্ষয়িত্রীর মনে হ'ল যে ঘণ্টা বাজাবার সময় হ'য়েছে, তখনই তিনি তাঁর ভূমিকা বদলে নিয়ে সে কাজটি স্বয়ং সেরে নিলেন। শিক্ষয়িত্রী যে হয়েছে, তার ভাবটি বিশেষ ক'রে দেখবার মত ; বসা, দাঁড়ান, চলা, এমন কি কথা বলার ভঙ্গীটিতেও কল্পনার শিক্ষয়িত্রীর ছবিটি অসাধারণ যত্ন ও নৈপুণ্যসহকারে অনুসরণ করা হ'য়েছে।

ছোটদের ক্রিয়া ও কথাবার্ত্তার যে সব দৃষ্টান্ত উপরে বিবৃত হ'ল, তা থেকে একটি কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। তা এই যে, শিশুর মানসিক বিকাশের ব্যাপারটি কয়েকটি বাঁধাধরা পর্য্যায় বা স্তরে ভাগ

করা যায় না। এ কথা সত্য যে সূক্ষ্ম যুক্তি এবং তা ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতা স্বভাবতঃ এগার বছরের পরে আসে, তবু এটি আপেক্ষিক গুরুত্বের বিষয়, একেবারে নির্দ্দিষ্ট ও চরম ব্যাপার নয়। সাত বছরের পরে কেন, তার চেয়ে ছোট বয়সেও শিশুকে কেবল নিয়ম ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল চিন্তাশক্তিবিহীন প্রাণী বলা চলে না। তেমনই নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীর সাত থেকে এগার বছর বয়সের মধ্যে যে শিশুর শুধু 'হাতে কলমে' বিচার করবার ক্ষমতাই থাকে, কথার সাহায্যে বিচার বা যুক্তি প্রদর্শন করবার শক্তি হয় না, সে কথাও ভুল।

আর একটি জিনিষও দেখা যাচ্ছে যে, শিশুরা তাদের যুক্তি যে কথায় ব্যক্ত করে, তার মূলে এক প্রধান প্রেরণা হচ্ছে তাদের খেলার ঝোঁক, এবং এই খেলা নিয়ে তাদের যে সব কথা ও আলোচনা হয়, সেগুলি। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হ'লে তাদের হঠাৎ চিন্তামূলক কথা বলতেও শোনা যায়, তবে অবশ্য তারা একভাবে বেশীক্ষণ শুধু কথার সাহায্যে সূক্ষ্ম চিন্তা করতে পারে না। কল্পনায় আশ্রিত ধারণাসমূহের সাহায্যে চিন্তা করবার যে শক্তি, যেটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগে অত্যাবশ্যক, তার রীতিমত বিকাশ এগার বার বছর বয়স পর্য্যন্ত হয় না বটে, কিন্তু তার বহু আগে ছেলেমেয়েদের কথাবার্ত্তায় এর আভাস প্রায়ই পাওয়া যায়। ছোটরা যখন তাদের মন-গড়া কল্পনার খেলা খেলে, কিংবা কোনও কার্য্যকরী ব্যাপারে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা করে, তার মধ্যেও এর প্রভাব এসে পড়ে।

মাত্রায় কম বেশী হ'লেও ছোট শিশুদের মনের এই বৈশিষ্ট্য তাদের শিক্ষার দিক থেকে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুরা প্রধানতঃ হাতে কলমে কাজ করতে চায়, আর বিধানের চেয়ে বস্তু সম্বন্ধেই তাদের আগ্রহ অধিক

শুধু তাই নয়, এই বিধানের জ্ঞানও তাদের বস্তুর ধারণা থেকেই আসে। কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের সূক্ষ্ম চিন্তার প্রথম উৎপত্তি ও বিকাশ তাদের কম বয়সের বাস্তব ক্রিয়াগুলি অবলম্বন ক'রেই ঘটতে থাকে। সুতরাং শিশুর উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াবলী পুষ্ট ক'রতে হ'লে, সেগুলির উৎপত্তি যে সরল ব্যাপার থেকেই হয়, সে কথাটি বুঝতে হবে।

এই গ্রন্থের সূচনায় বলা হ'য়েছিল যে, শিশুদের মনে কিরূপ ক্রিয়া চলতে থাকে, সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা শিক্ষকের অধ্যাপনাকার্য্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীকক্ষের সকল ব্যবহারিক সমস্যার বিষয়ে বিধিমত ও বিস্তারিত আলোচনা করবার স্থান এই পুস্তকে হয় নি বটে, তবে বিষয়টির সাধারণ কথাগুলি যথেষ্ট উদাহরণ সহকারে সমস্তই আলোচনা করা গেল। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় মনোবিদ্যার এই সকল তথ্যের ব্যবহারিক তাৎপর্য্য কি, তাই এখন সংক্ষেপে বলা যাবে। এগুলির সাধারণ কার্য্যকরী প্রয়োগ ভালভাবে বুঝতে পারলে, নিম্ন প্রাথমিক পাঠ্যসূচী ও অধ্যাপনাপদ্ধতির প্রত্যেক অংশে এবং সমগ্র বিদ্যালয়জীবনেও তার গুরুতর প্রভাব পড়বে।

প্রথমেই দেখা যায় যে, শিশুদের চিন্তা সম্বন্ধে যে আলোচনা এখনই করা গেল, তার সঙ্গে বিভিন্ন বয়সে তাদের আগ্রহ এবং তাদের সামাজিক বিকাশের পূর্ণ সামঞ্জস্য র'য়েছে। এই সকল দিক থেকেই একই মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাত বছরের নীচের শিশুদের মত, সাত থেকে এগার বছর বয়সের শিশুদের পূর্ণ বিকাশও তাদের ক্রিয়া থেকেই ঘটে থাকে। শিশুর স্বকীয় ক্রিয়াশীলতার নানাবিধ মূল্য আমরা দেখতে পেয়েছি। তাদের দেহের বিকাশ, ভঙ্গীর সমন্বয় ও নৈপুণ্য সাধনের জন্য এর প্রয়োজন। তার আত্মকেন্দ্রিক ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও জগৎ সম্বন্ধে ছেলেমানুষী ধারণার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে

তাকে মুক্ত করাও এরই কাজ। আবার শিশুদের ক্রিয়াগুলির মধ্যেই এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যার ফলে তাদের ভাষাগত যুক্তিপ্রয়োগ ও আলোচনার প্রেরণা আসে। যেদিক থেকেই আমরা ব্যাপারটি বিবেচনা করি না কেন, আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌছব যে, শিশুদের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ, তাদের সক্রিয় সামাজিক অভিজ্ঞতা, তাদের চিন্তা ও কথাবার্ত্তা, এইগুলিই তাদের শিক্ষার প্রধান সহায়। শিক্ষক হিসাবে শিশুর এই ক্রিয়াশক্তিকে জাগ্রত করা, এবং এটি আপনা হতে দেখা দিলে, তার উপযোগী ব্যবস্থা করাই হ'ল আমাদের কাজ। যে সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাদের নিজেদের ঝোঁক আছে, সেগুলির সমাধান যাতে তারা করতে পারে, সে ব্যবস্থা আমরা ক'রে দিতে পারি ; কিন্তু যা তাদের নিজস্ব আগ্রহসম্ভূত নয়, তেমন সমস্যা জোর ক'রে তাদের উপর চাপিয়ে দিলে সুফল হয় না। আর তাদের চারদিকের জিনিষ ও মানুষের, পথঘাট, বাজার, রেলগাড়ী, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ, এই সবের বিষয়ে তাদের নিজেদের যে সখ থাকে, তাই থেকেই তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় যাবতীয় সুযোগ আমরা পেয়ে যাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই বয়সে শিশুর সকল শিক্ষা, তা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত বা প্রকৃতি-পাঠ, যাই হোক না কেন, যদি যথার্থ ফলপ্রদ ক'রতে হয়, তবে সে শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও কার্য্যকরী হওয়া চাই। শিশু যে সব বাস্তব জিনিষ দেখতে পায়, হাতে নিতে পায়, তৈয়ারী করতে বা মাপতে পারে, এমন সব বস্তুর সঙ্গে সে শিক্ষার সম্পর্ক থাকা দরকার। প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম দিকেই এ কথা বিশেষভাবে সত্য, কিন্তু একটু বড় দশ এগার বছরের শিশুর পক্ষেও এই কথা যথেষ্ট খাটে। এই বয়সে বস্তুর পরিবর্ত্তে শুধু কথা বা ধারণা প্রয়োগ করা যায় না, তবে বস্তুর অভিজ্ঞতা কথায় প্রকাশ করা যায়। ধারণাগত যুক্তি যদি প্রত্যক্ষ

কার্য্যকরী ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত না হয়, তবে এই বয়সের শিশু তা প্রয়োগ ক'রতে পারবে না। সুখের কথা এই যে আজকাল সকল শিক্ষাব্রতী এই কথাটি বুঝেছেন। তবে এর কার্য্যকরী প্রয়োগ আরও বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় হওয়ার প্রয়োজন র'য়েছে।

কিন্তু তা হলেও এই শিশুদের ভাষাগত যুক্তি প্রয়োগেরও সুযোগ থাকা চাই। তারা যে ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে কথা বলবে বা যুক্তি প্রয়োগ করবে, এমন ভাবা চলে না ; তবে তারা যা হাতে কলমে করছে, সে বিষয়ে তাদের বলতে দেওয়া এবং তাতে উৎসাহদান করা উচিত। আর এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, শিশুদের কাছে আমাদের মৌখিক বাক্য ও উপদেশ মূল্যহীন মনে হলেও তাদের সঙ্গে আমাদের কথা বলবার আগ্রহ হ'ল স্বতন্ত্র জিনিষ, এবং তার সার্থকতা যথেষ্ট রয়েছে। সুতরাং আমাদের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুর পক্ষে তার অভিজ্ঞতাসমূহ কথায় প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়া বিশেষ প্রয়োজন ; বর্ণনা, আলোচনা ও তর্ক, সবই তার চাই। তাকে কিছু ক'রতে না দিয়ে শুধু মৌখিক শিক্ষা দিয়ে গেলে যেমন তার মন নির্জ্জীব হ'য়ে যাবে, তেমনি তাকে সঙ্গীদের সঙ্গে অবাধে কথা বলতে না দিলে তার বুদ্ধিগত ও সামাজিক পরিণতির অতি মূল্যবান সুযোগ কেড়ে নেওয়া হবে। যে সব ক্রিয়ার প্রতি তার ঝোঁক আছে, সেগুলি সম্বন্ধে খেলার সাথী ও বয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে মনখোলা কথাবার্ত্তা থেকেই তার সুস্পষ্ট চিন্তা এবং যুক্তিবোধ বিকাশের অতি স্বাভাবিক প্রেরণা আসে।

এই সব কথা আমরা যথার্থ উপলব্ধি ক'রতে পারলে বিদ্যালয়ের অবস্থাও একেবারে বদলে যাবে। আমরা এতদিন এই ভুল ক'রে এসেছি, এবং এখনও ক'রে চলেছি যে, শিশুদের মৌখিক কথাবার্ত্তার পথ

বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে; অথচ বড়ই অদ্ভুত কথা এই যে, তার সঙ্গে আমরা চাই যে শিশু যেন সহজে ও স্বচ্ছন্দে রচনা লিখতে পারে। শিশুর রসনা নীরব ক'রে রেখে তার লেখনীই মুখর হোক, এই আশা করা হয়। এইভাবে শিশুর ক্রিয়ার এক অত্যাবশ্যক অঙ্গই বাদ পড়ে যায়, এবং এর ফলে তার চিন্তা এবং ভাবপ্রকাশের যে অক্ষমতা দেখা যায়। তার জন্য আমরাই সম্পূর্ণ দায়ী।

চতুর্থতঃ, শিশুর ক্রিয়াশক্তির চালনা ঠিকমত হওয়ার জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থায় কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। শ্রেণীগুলি আকারে ছোট হওয়া দরকার, আর অধ্যাপনা প্রণালীও এমন হওয়া উচিত যেন তা শিশুগুলির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অনুকূল হয়। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণীগঠন মনোবিদ্যাসঙ্গত প্রণালীতে শিশুদের সামর্থ্যগত পার্থক্যের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন; এই বিষয় বিস্তারিত-ভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতির পাঠে শিক্ষকই হন বক্তা, আর শিশুগুলি বলতে গেলে নীরব শ্রোতা মাত্র। এমন পাঠে বিভিন্ন শিশুর প্রভেদের গুরুতর ব্যাপারটি অন্ততঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। অধ্যাপনার এই ভ্রান্ত পদ্ধতির উপর প্রধানতঃ নির্ভর ক'রে থাকলে অবশ্য যথেষ্ট বিভিন্ন সামর্থ্যের শিশুদের নিয়েও শ্রেণীগঠন করা যায়, এবং তার ফলে তাদের সময় যে কতটা বৃথা নষ্ট হচ্ছে তা নজরেও পড়ে না। কিন্তু যখনই আমরা এই কথা বুঝতে পারি যে, শিশুগুলি নিজেরা যা করে ও বলে, তাই থেকেই আসলে তাদের শিক্ষা হয়, আর তাদের উপযুক্ত ক্রিয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্য সচেষ্ট হই, তখনই এক শিশু ও অপর শিশুর মধ্যে বৈষম্যের প্রশ্নটি এসে পড়ে। তখন আমরা দেখতে পাই যে, শ্রেণীর সংখ্যা যদি খুব বেশী হয়, আর তার ভিতরে অল্পবুদ্ধি থেকে বেশী মেধাবী

সব রকমের বালক থাকে, তবে তাদের চুপ করিয়ে রেখে তাদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। আমরা জানি যে, আগেকার দিনে যে শিশুদের নীরব ও শান্ত ক'রে রাখা হ'ত, তার মূলে যতটা ছিল শিশু মনোবিদ্যার অজ্ঞতা, ততখানিই ছিল এই বৃহদাকার শ্রেণীর সমস্যা। কিন্তু শ্রেণীগুলিকে ছোট ক'রে যদি এমনভাবে সাজান যায় যে, মোটামুটি সমান শক্তিসামর্থ্যের ছেলেরাই এক শ্রেণীতে স্থান পায়, তাহ'লে তাদের অবাধে নিজে হতে কাজ করতে দেওয়া অনেকটা সম্ভব হয়, কারণ এই ক্রিয়ার মধ্যেই তাদের প্রাণশক্তি রয়েছে।

শিশুর সক্রিয়তার গুরুতর প্রয়োজন সম্বন্ধে যখন আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা হবে, তখনই আমরা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ব্যক্তিগত পদ্ধতি ও সমবেত পদ্ধতির আসল তাৎপর্য্য ও তুলনামূলক উপযোগিতা বুঝতে পারব। এই দুই প্রণালীর একটিকে বেছে নিয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার প্রয়োজন হয় না; কোনটি কোন স্থলে উপযুক্ত হবে, সেই কথাই বুঝে নেওয়া দরকার হয়। কোনও কোনও ব্যাপারে কেবল ব্যক্তিগত পদ্ধতি দ্বারাই সকল শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে কাজ করা ও চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। যেমন পাঠ ও লিখনশিক্ষার প্রথম দিকে, পাটীগণিত ও জ্যামিতিশিক্ষায়, ইতিহাস ও ভূগোলের অনেক পাঠে এই কথা অনেকখানি খাটে। শিশুকে হাতে কলমে যে সব ক্রিয়া করতে হয়, তারও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য; কারণ জিনিষ গড়া, ছবি আঁকা বা মূর্ত্তিগঠনে সকল শিশুই একটি মাত্র নমুনায় আবদ্ধ না থেকে প্রত্যেকে নিজের নিজের আদর্শ যদি নিজস্ব গতিতে অনুসরণ করতে পায়, তবে তাদের কাজও অনেক বেশী সুন্দর ও সফল হয়।

আবার অনেক ক্রিয়া আছে, যেগুলি স্বভাবতঃ সমষ্টিগত ব্যাপার; সমবেতভাবে করলেই প্রধানতঃ এগুলির সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা দেখা

যায়। এমন নানা বিষয়ের মধ্যে খেলাধূলা, নৃত্যগীত ও অভিনয়ের উল্লেখ করা যায়। শ্রেণীকক্ষের যত্ন ও বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থাকেও এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়, আর এই ক্রিয়াগুলিতে ছোট ছেলেদেরও সক্রিয় ও দায়িত্বশীল অংশ নিতে দেওয়া উচিত। এর অর্থ নয় যে, পুরাতন শিক্ষারীতির অনুসরণে প্রত্যেকটি শিশু পৃথকভাবে এক সময়ে একই জিনিষ করবে। এর আসল তাৎপর্য্য এই যে, এক বৃহৎ, সম্পূর্ণ, বাস্তব ও বাঞ্ছনীয় ব্যাপারে শিশুরা প্রত্যেকে নিজের নিজের বিশেষ ক্রিয়াটি সাধন করবে।

এই পুস্তকে বিবৃত তথ্যাবলী থেকে হাতে কলমে শ্রেণীশিক্ষার যে সব সূত্র পাওয়া যায়, তারই কয়েকটি উপরে দেওয়া গেল। বুদ্ধিমান শিক্ষক এ ছাড়া আরও অনেক মূল্যবান সিদ্ধান্ত নিজেই গড়ে নেবেন, এবং সেগুলি তাঁর দৈনিক অধ্যাপনায় সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সাত থেকে এগার বছরের শিশুর মানসিক বিকাশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ই শুধু এই বইটিতে দেওয়া গেল। এই অল্প পরিসরের মধ্যে শিশুর মনের সম্পূর্ণ ও বিধিবদ্ধ আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আর প্রত্যেকটি বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয় এবং অধ্যাপনার বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ দেবার চেষ্টাও আমরা করি নি। এগুলির জন্য তদুপযোগী পুস্তকের সাহায্য নিতে হবে। আমরা যদি উপরে বর্ণিত শিশু মনোবিদ্যার সাধারণ তথ্যগুলি এবং তাদের কার্য্যকরী প্রয়োগ সম্বন্ধে পাঠকদের আগ্রহের সঞ্চার করতে পেরে থাকি, তা হ'লেই মনে করব যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।
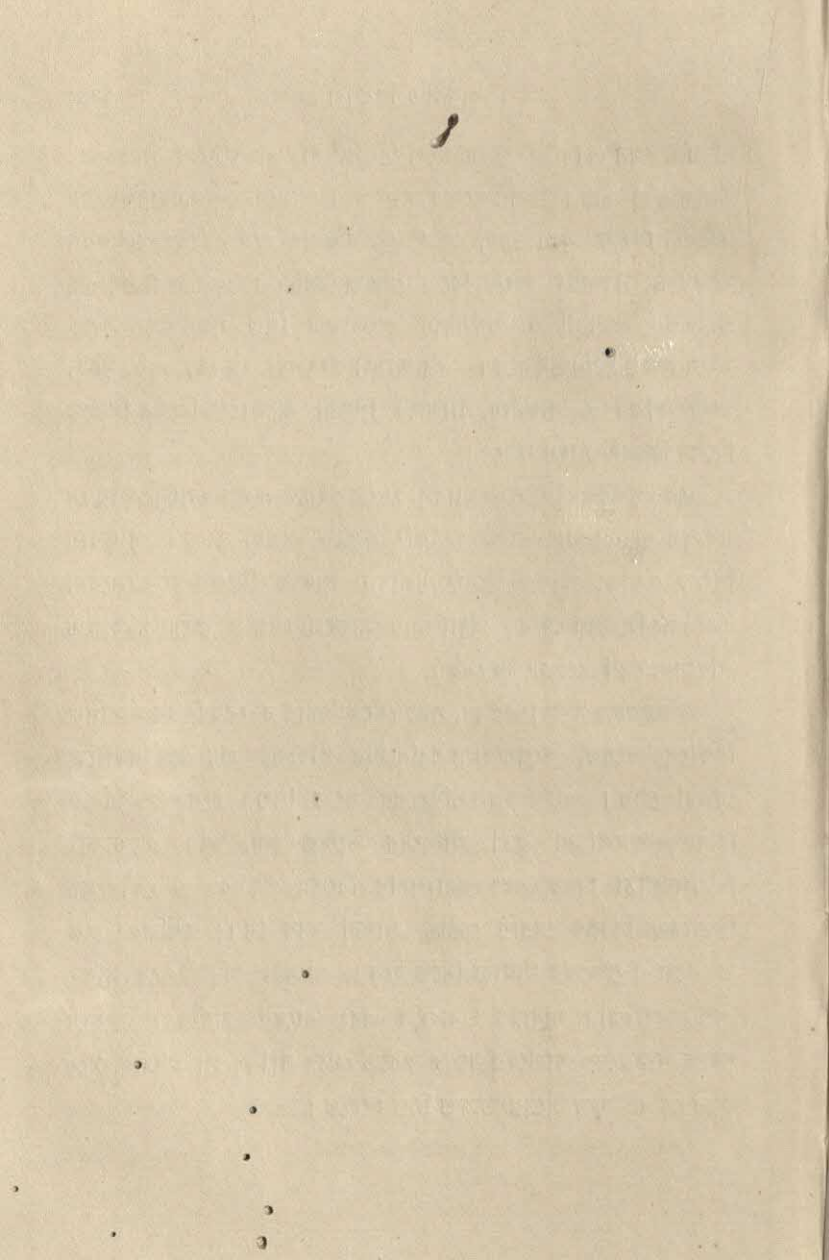
কয়েকটি পুস্তক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা, বিশ্বভারতী

P. B. Ballard, *Mental Tests.* University of London Press, 1935

A. Binet & Th. Simon, *Mentally Defective Children.* Edward Arnold

C. Burt, *The Backward Child.* University of London Press, 1938

M. K. Gandhi, *Basic Education.* Navajivan Publishing House, 1951

A. Gesell, *Guidance and Mental Growth in the Infant and Child.* Hamish Hamilton

S. M. Gruenberg, *You and Your Child.* J. B. Lippincott

M. Montessori, *The Secret of Childhood.* Longmans, 1936

T. P. Nunn, *Education : Its Data and First Principles.* Edward Arnold, 1930

J. Piaget, *The Child's Conception of the World.* Kegan Paul, 1929

V. Rasmussen, *The Primary School Child.* Gyldeudal, 1929

Bertrand Russell, *Education.* George Allen & Unwin

C. Spearman, *The Abilities of Man.* Macmillan, 1927

বিষয় নির্দ্দেশ